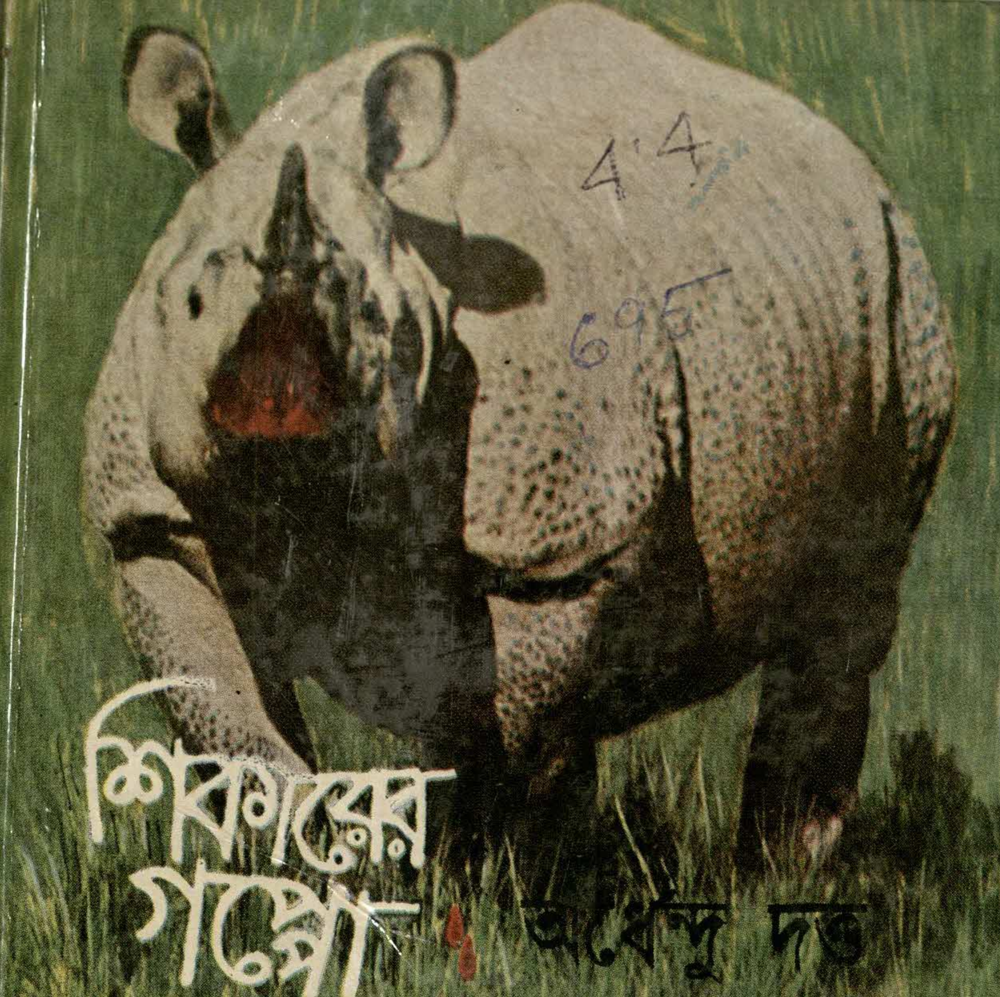


শিকারের গপ্পো

অর্ধেন্দু দত্ত



শিকারের গপ্পো

অর্ধেন্দু দত্ত

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
বইমেলা
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭

প্রকাশক :
শ্রীসুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীমণীন্দ্রনাথ মান্না
পারুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম : ১০ টাকা

উৎসর্গ

এ-সব অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনী শুনতে যাদের সবচেয়ে
বেশ আগ্রহ, তাদের হাতে—

ডিউক, লোহিতা, রাহুল, টিন্‌টি, য়্যাটম্‌, ট্যাটম্‌, তাতন, ছোটন, টুকটুকি,
তুলি, শিখা, চিত্রিতা, নবনীতা, রঞ্জু, ঝন্টু, ইলা, সুনন্দা,
রুনা, রাজা, বেবি ও দীপালিকে।

নিবেদন

লেখকের সত্যিকারের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কাহিনীগুলো লেখা। বন্য প্রাণীদের আচার-ব্যবহার, চলাফেরা প্রভৃতি নানা তথ্য তিনি নিখুঁতভাবে প্রকাশ করেছেন।

লেখক শৈশব হতে যৌবনকাল পর্যন্ত আসামের জঙ্গলে বহু শিকারীর সাথে প্রত্যক্ষ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, বন্য জীবজন্তুদের আকৃতি-প্রকৃতি ও ছবি আঁকার উদ্দেশ্যে রাতের পর রাত মাচায় কাটিয়েছেন।

অর্ধেন্দু দত্ত প্রসিদ্ধ সাংবাদিক-শিল্পী, পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতে বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় অতি পরিচিত নাম। প্রায় ৪৮ বছর আনন্দবাজার পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন। বাড়ি ফরিদপুরে। জন্মস্থান আসামের মাটিতে। লেখাপড়া ও শিক্ষা কলকাতার স্কুল, কলেজ ও সরকারি আর্ট কলেজ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লাহোর হতে সাংবাদিকতার সার্টিফিকেট নিয়ে 'সহকারি মিলিটারি পাবলিক লিয়াজন অফিসার'রূপে কয়েক বছর সরকারি কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

তখন প্রসিদ্ধ বন্যপ্রাণী প্রেমিক ও শিকারী জিম করবেটের সাথে মেশার সুযোগ তাঁর ঘটেছিল। ই. পি. জী-র সাথে আসামের জঙ্গলে রাত কাটাবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল।

লেখনী ও তুলি অর্ধেন্দুবাবুর হাতে সমভাবে ক্রীয়াশীল। 'আমাদের আসাম' ও 'আমাদের দেশ' (শিশু বিভাগ) পত্রিকার প্রাক্তন সহ-সম্পাদক।

তদানীন্তন বড়লাট পত্নী লেডি লিন্‌লিথগো অর্ধেন্দুবাবুর কাজের উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদও তিনি পেয়েছিলেন। ফলে পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীর প্রকাশনের বহু পুস্তকের কভারের লেটারিং ডিজাইন অর্ধেন্দু দত্ত কর্তৃক অঙ্কিত হয়েছে।

লেখকের লিখিত পুস্তকের মধ্যে 'শিকারের জার্নাল', 'ভারতীয় শিল্পকলা,' 'রূপময় ভারত' ও কতিপয় স্কুলপাঠ্য বিশেষভাবে সমাদৃত।

—প্রকাশক

সূচীপত্র



হাতিখালির হাতি রসগোল্লায় মতি

সেবার পুজোর ছুটিতে উত্তর কাছাড়ের মিকির বন্ধু উই সিং-এর আমন্ত্রণে হাতিখালি গ্রামে যাব বলে ঠিক করলাম।

নিলামবাজারের লাখুদার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছি। তিনি নাকি সুন্দরবনে কয়েকটা বিরাট রয়েল বেঙ্গল টাইগার মেরেছেন। নোয়াখালির মানপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার সত্যেন সেনের সঙ্গে আসামের জঙ্গলে মাঝে মাঝে হাতি খেদার ছবিও তুলেছেন।

বললাম : তা আপনি এতো বড় শিকারী, আপনি না গেলে হবে না দাদা। ভরসা পাই কই! শিয়াল দেখেই ভয় পাই, আপনি গেলে তবু ভরসা পাব।

লাখুদা বললেন : বলছিস যখন চল্, ওসব আমার ঘোরা আছে।

উই সিং-এর স্ত্রী চাম্বা ও মেয়ে অম্বা একবার গৌহাটিতে বাঙ্গালী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের রসগোল্লা খেয়ে বার বার আমায় লিখেছেন—আসার সময় যেন দু' হাড়ি খাঁটি বাঙ্গালী রসগোল্লা নিয়ে আসি। পাহাড়ী অঞ্চলে ওসব সুস্বাদু বাঙ্গালী মিষ্টি নাকি পাওয়া যায় না।

নির্দিষ্ট দিনে আমরা চার বন্ধু শিলং হতে গৌহাটি এলাম, তারপর ট্রেনে চেপে বসলাম। লাখুদার পিঠে ঝুলানো রাইফেল—পরনে হাফ প্যান্ট, মাথায় টুপি—একেবারে খাঁটি ইংরেজ শিকারীর মত। সত্যেনের কাঁধে ঝুলন্ত ক্যামেরা। আমি ও উই সিং সাদামাঠা পোশাকে খাঁটি ভারতীয়।

লামডিং-এ ট্রেন বদল করে বিকেল চারটায় আমরা হাতিখালি স্টেশনে নামলাম। লামডিং জংশন হতে প্রায় দশ মাইল দক্ষিণে পাহাড়-লাইনে হাতিখালি স্টেশন। গ্রামের নামও তাই। ঝক্ঝকে তক্তকে ছোট গ্রাম। ছুঁচ পড়লে তুলে নেওয়া যায়।

একটি কুলি বহু আগেই রওনা হয়ে গিয়েছে। আর একটি কুলি

পিঠে হালকা মালপত্র সব চাপিয়ে রসগোল্লার হাড়ি দু'টো সাবধানে ঝুলিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে চলল।

বনে জঙ্গলে ঘোরার একটা নেশা আছে, আনন্দও আছে প্রচুর। তারই আকর্ষণে বহুবার গেছি সুদূর আসামের জঙ্গলে—হাতিখালি, শোনবিল, নেফার গভীর বনে, মিজো হিলের অরণ্যে আর হাজারিবাগের ফরেস্টে। স্টেশন হতে পাহাড়ের গভীর বন-পথে সোজা পুব দিকে কুঁড়ি-পঁচিশ মাইল হাঁটলে নাগাপাহাড়ে পৌঁছানো যায়।

হাতিখালি নামটি শুনে মনে হয়—বনে হাতি খালি হয়ে গেছে বুঝি। কিন্তু আসলে ঠিক তার উল্টো। জঙ্গলে খালি হাতি আর হাতি। আশেপাশের অরণ্যে প্রচুর হাতি বিচরণ করে। পাকা ধানক্ষেত চষে, পাহাড়ের গায়ে মিকির কৃষকদের কলাবাগান, শাকসব্জীর ক্ষেত তছনছ করে হাতির দল মাঝে মাঝে গভীর বনে উধাও হয়ে যায়।

চারিদিকে গভীর বন-জঙ্গলে ঘেরা এক অপরূপ দৃশ্য। নিঝুম, নিস্তব্ধ—আধ আলো, আধ অন্ধকারে আশেপাশের গাছগাছালি যেন আচ্ছন্ন।

গা ছম্ ছম্ করে ওঠে।

কিছুটা পাকা রাস্তা তারপর শুরু হয়েছে এবড়ো-খেবড়ো উঁচু-নিচু রাস্তার চিহ্ন।

সুন্দর সাজানো গ্রাম। সবুজ মাটি আর পাহাড়ের আশেপাশে শুধু হাতিখালি গ্রামকে রকমারি গাছগাছালির সবুজ ঢেকে রেখেছে। আকাশ ছোঁয়া নীল পাহাড়ের ওপর সাদা সাদা মেঘের টুকরো, মনে হয় দেবতার বাসস্থান স্বর্গলোক।

রসগোল্লার মিষ্টি গন্ধে পাহাড়ী পোকাগুলো ভন্ ভন্ করে হাড়ির চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর মাঝে মাঝে কুলিটি হাত নেড়ে বিরক্ত প্রকাশ করছে।

স্টেশনের সীমা ছাড়িয়ে গ্রামের দিকে এগিয়ে চলেছি। এতক্ষণ স্টেশনে কোলাহল ছিল, বহু লোকের আনাগোনা—চেনা-অচেনা

বহুজনের মুখ দেখেছিলাম। আর এখন যেন ক্রমশ নিস্তব্ধ হয়ে আসছে।

দু'পাশের বসতি কমে আসছে। মাটিরও রূপ বদলাচ্ছে। মাঝে মাঝে শুষ্ক কর্কশ মৃত্তিকা। গাছগাছালিও যা দেখা যায় ওই বাবলা, চাম, সুন্ধি, নাগেশ্বর, শাল বা ওই জাতীয়।

স্তব্ধ বনরাজ্য কোন্ অন্তহীন রহস্য বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে— আমরা ক'টি প্রাণী ওরই মধ্য দিয়ে পথ করে এগিয়ে চলেছি।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো।

লাখুদার মুখে টুঁ শব্দটিও নেই। সত্যেন দু'একবার ক্যামেরার সাটার টিপেছিল। চার মাইল পথ অতিক্রম করে এসেছি—এখনো মাইল তিনেক পথ, পাহাড়ী পথ। দূরে গ্রামের বিক্ষিপ্ত আলো মিট্ মিট্ করছে।

ঘড়ির কাঁটায় তখন প্রায় পৌনে আটটা। টর্চের আলো ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে গা-টা শির্ শির্ করে উঠছে।

হঠাৎ কুলিটি দাঁড়িয়ে পড়ল কেন? সবারই মনে একই প্রশ্ন।

পথের ধারে কিছু হালকা জঙ্গলে কি যেন নড়ে উঠল। কালো কালো ওইগুলো কি দেখা যাচ্ছে!

উই সিং-এর কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বললাম: হাতি নয় তো?

সবাই একটা বিরাট গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

ছায়াগুলো ক্রমশ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। পথের বাঁকটা ঘুরতেই স্পষ্ট দেখতে পেলাম একদল হাতি, সংখ্যায় ছ'টি।

কাল বিলম্ব না করে মনুমেন্টের মত একটি বড় উঁচু গাছে উঠে পড়লাম। সবার আগে সাহসী শিকারী লাখুদা তড়বড়িয়ে গাছের ডগায় চেপে বসলেন। আমরাও তাকে অনুসরণ করলাম।

মালপত্রগুলো ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখে বুদ্ধিমান কুলিটি অতি সন্তর্পণে মিষ্টির হাড়িসহ একটি ঝোপ-ঝাড়ওয়ালা গাছে চড়ে বসল।

এক পা এক পা করে হাতির দল মন্থর গতিতে এগিয়ে এলো। সঙ্গে দু'টি বাচ্চাও রয়েছে। সাধারণত হাতিরা দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করে।

লাখুদার জোরালো রাইফেলের ট্রিগারও স্তব্ধ, আর সত্যেনের ক্যামেরার সাটারও চুপ!

দলপতি দাঁতালো হাতিটি ভাল করে চারদিক নিরীক্ষণ করতে লাগল। আমাদের হদিশ ওরা কিছুতেই খুঁজে বের করতে পারল না। কিন্তু আমাদের অবস্থান ওরা টের পেয়েছে।

হাতির দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, কিন্তু ঘ্রাণশক্তি প্রখর।

এগিয়ে এলো, যে গাছে কুলিটি মিষ্টির হাড়িটি ঝুলিয়ে বসেছিল। বাচ্চা দু'টি ও অন্যান্য হাতিগুলোও গাছটাকে ঘিরে দাঁড়াল।

রসগোল্লার গন্ধে কি ওরা আকৃষ্ট হয়েছে, না মানুষকে চিরশত্রু মনে করে? বাগবাজারের রসগোল্লার স্বাদ কি ওরা পেয়েছে অথবা ওরা কোনকালে কলকাতার চিড়িয়াখানার বাসিন্দা ছিল, কোন্‌টা?

মট্‌ মট্‌ করে ডালপালা ভেঙে হাতির দল বিক্ষোভ জানাতে লাগল — আমাদের দাবি চলছে ও চলবে।

কুলিটি যে গাছে বসেছিল, সেটা উপড়ে ফেলবে কি?

না, অত বড় গাছ উপড়ানো চারটিখানি কথা নয়!

আস্তে আস্তে গাছের চারদিকের ঝোপঝাড় প্রায় ওরা পরিষ্কার করে ফেললো। পেটের ভেতর থেকে শুঁড় দিয়ে জল এনে গাছের গোড়ায় ছিটিয়ে দিতে লাগল। যা দেখলাম তাতে গলা শুকিয়ে গেল।

ধপ্‌-ধপাং-ধপ্‌! ধানি বোমার শব্দের মতন।

ভয়ে রসগোল্লার দু'টো হাড়িই কুলিটির হাত হতে ফস্‌কে গিয়ে বাচ্চা হাতি দু'টোর ঘাড়ে গিয়ে পড়েছে, যেন ধেড়েকে ছেড়ে ছোড়া দু'টোকে ধর!

চারদিক রস ও রসগোল্লায় ছড়াছড়ি।

অতর্কিতে এ ঘটনায় প্রথমে হাতির দল ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে

গেল। তারপর মিষ্টির স্বাদ পেয়ে হস্তিযূথের কি আনন্দ। না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কাড়াকাড়ি মারামারি করে নিমিষে রসগোল্লা সব নিঃশেষ হয়ে গেল।

চাম্বা বৌদি ও অম্বার কথা মনে হল একবার।

এবার দেখলাম হস্তিযূথ গাছের চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে শুঁড় তুলে রসগোল্লা ভিক্ষা করতে লাগল যেন!

প্রায় আধ ঘণ্টা আমরা চুপচাপ গাছের শাখা আঁকড়ে পড়ে রইলাম। হঠাৎ দেখি একদল পাহাড়ী মানুষ মশাল জ্বেলে হাট থেকে গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। হাতে ওদের ধারালো টাঙ্গি ও বর্শা।

হাতির দল মাথা উঁচু করে একবার তাকালো।

তারপর দুম্‌দাম্‌, ধুপধাপ মট্‌মট্‌ শব্দ করে ডালপালা ভাঙতে ভাঙতে বনের ভিতর অদৃশ্য হলো।

এবার লাখুদা তার রাইফেলটি বাগিয়ে ধরলেন। আমার কিছুই ধরার নেই—এমনকি লাঠিখানাও গাছের নিচে ফেলে এসেছি।

তাই লাখুদাকে জাপটে ধরে বললাম : লাখুদা, হস্তিযূথ যখন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, তখন আর ঝামেলার প্রয়োজন কি?

উত্তরে লাখুদা বললেন : তোরা সঙ্গে থেকেই যত বিপদ বাড়িয়েছিস্‌, নতুবা আজ দু'চারটাকেই কাত করে দিতুম। আমার রাইফেল হেরিংটন সাহেব ও নিলামবাজারের ঝানু শিকারী খগেন দত্ত মহাশয় পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন।

উই সিংকে দেখলাম ধীর, স্থির।

ধীরে ধীরে আমরা গাছ থেকে নেমে এলাম। উই সিংকে দেখে গ্রামের লোকেরা জিজ্ঞাসাবাদ করে সব ঘটনা জেনে নিল।

মনে হলো ওদের কাছে এ ঘটনা এমন কিছুই নয়, নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

আমাদের কিন্তু কাঁপুনি দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল!

বনের পথ ধরে আবার হেঁটে চলেছি। জঙ্গলটা ক্রমশ ঘন হয়ে

গভীর অন্ধকারে মিশেছে। প্রকাণ্ড বড় বড় গাছ। একটারও নাম জানি না। আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার—একটি শব্দ নেই। পাখি, জানোয়ার, ব্যাঙ, ঝিঁ-ঝিঁ পোকা, কাক, চড়ুই, তক্ষক, ভক্ষক কিছুই না। এমন থমথমে বন স্বপ্নেই দেখা যায়।

লাখুদার রাইফেল দেখে ওরা সবাই পালিয়েছে যেন!

রাত প্রায় দশটায় উই সিং-এর গ্রামের বাড়িতে প্রবেশ করলাম। মনে হলো লাখুদার কাছে ঝুলানো রাইফেল থেকেও না-থাকার সামিল।

দক্ষিণে মুলিবাঁশের প্রকাণ্ড ঝাড়। সেই ঝাড়ের একধারে ছোট বড় দু'টি দোচালা ঘর। সেই ঘর থেকে হ্যারিকেন হাতে চাম্বাবৌদি এগিয়ে এসে আমাদের স্বাগত জানালেন।

অম্বা কুলির পিঠের মোটঘাট নামাতে সাহায্য করলো, আর এদিক-ওদিক কি যেন খুঁজে বেরালো।

চাম্বাবৌদি আমাকে ধেনুদা বলে ডাকেন।

বললেন: কৈ, আমার মিষ্টির হাড়ি কোথায়?

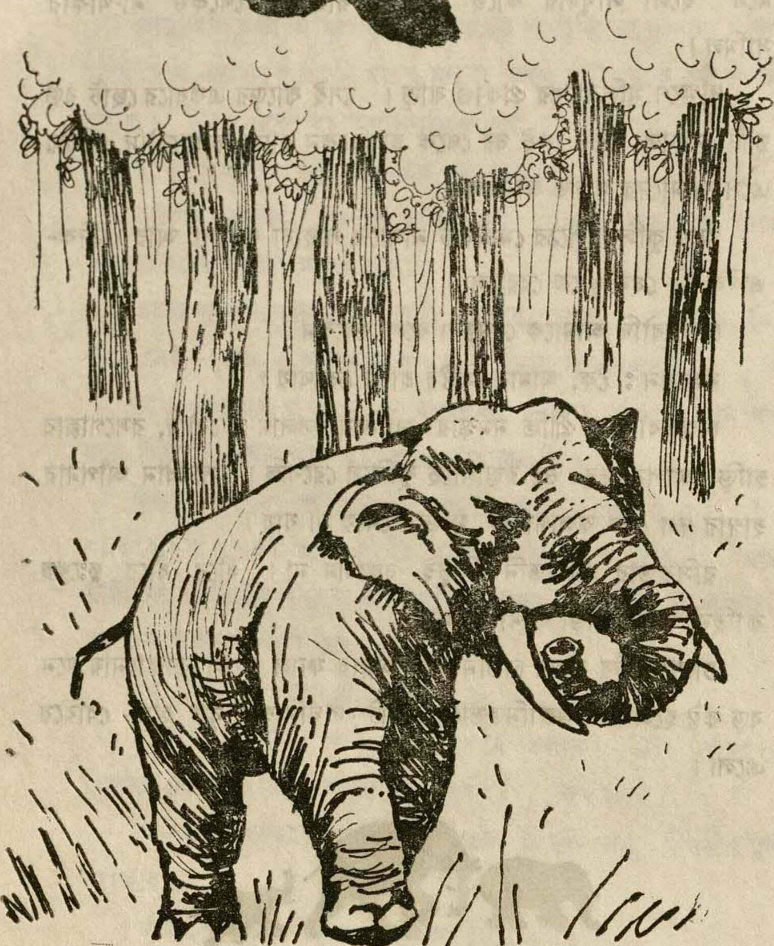
চাম্বাবৌদিকে প্রীতি নমস্কার জানিয়ে বললাম: বৌদি, রসগোল্লার হাড়ি আপনাদের ওই রম্ভাগাছে ঝুলিয়ে রেখেছি। সাবধান আপনার হাম্বার দল যেন কলাগাছটি মুড়িয়ে খেয়ে না যায়।

রসিকতার মর্ম তিনি কিছুই বুঝলেন না। ধীরে ধীরে দুঃখের কাহিনী আগাগোড়া বর্ণনা করলাম।

চাম্বাবৌদির করুণ চাউনি আর অম্বার ফ্যাল ফ্যাল তাকানোয় মনে বড় কষ্ট হলো। অজানিতভাবে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বুক হতে বেরিয়ে এলো।



হাতি



এবার হাতির আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলব।

ভারতের সর্বত্রই হাতি দেখা যায়। আসাম হতে আরম্ভ করে উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চল, বিহার, নেপাল সীমান্ত, উত্তর প্রদেশ, বিহারের পালামৌ, ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ ও গঞ্জাম অঞ্চল এবং দক্ষিণ ভারতের মহীশূর ও কেরল রাজ্যে প্রচুর হাতি বিদ্যমান। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ত্রিশটি হাতি আছে।

সারা ভারতে কত হাতি আছে বলা শক্ত। তবে বিভিন্ন বন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ আলোচনায় এটুকু জানা যায় যে, সমগ্র ভারতে কয়েক সহস্র হাতি রয়েছে।

বনে হাতি দেখতে হলে সাহস, বুদ্ধি ও ধৈর্যের দরকার সর্বাগ্রে।

সাধারণত হাতি দলবদ্ধভাবে থাকতে ভালবাসে। এক-একটি দলে দশ-বারোটি হতে ষাটটি পর্যন্ত হাতি একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। দলবদ্ধভাবে ওরা যখন চলাফেরা করে, তখন বয়স্কা অভিজ্ঞ হস্তিনীই দলের প্রথমে থাকে। মাঝে শিশুরা, পেছনে ও পাশে থাকে মদ্দা হাতির দল। দাঁতাল হাতির মধ্যে একজন থাকে লীডার। সেই পথ প্রদর্শক। কিন্তু যখন বাঘ বা চিতাবাঘ অথবা শত্রুর আশঙ্কা করে তখন অন্যান্য দাঁতওয়ালা পুরুষ হাতিগুলো সামনে এগিয়ে আসে।

আফ্রিকাতেও প্রচুর হাতি আছে। স্বভাবে ভারত ও আফ্রিকায় হাতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। তবে আকৃতিতে কিছু পার্থক্য চোখে পড়ে।

হাতির বাইরের দাঁতকে বলা হয় গজদন্ত। ভারতে পুরুষ হাতির ইয়া-বড় গজদন্ত থাকে কিন্তু মাদী হাতির থাকে না বললেই চলে (মুখের ভিতরে ছোট হু'টি দাঁত প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না)। কিন্তু আফ্রিকার পুরুষ ও মাদী উভয় হাতির গজদন্ত থাকে। হাতি যখন লড়াই করে

তখন শত্রুর শরীরে এই দাঁত বিঁধিয়ে দেয়।

কোনো কোনো পুরুষ হাতির গজদন্ত নেই, ইহাদিগকে 'মাখনা' হাতি বলে। মাখনারা সাধারণত দলভ্রষ্ট, দুর্ধর্ষ ও বদমাস প্রকৃতির হয় এবং একা একা ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে। এরাই গ্রামাঞ্চলে ঢুকে গৃহস্থের কলাগাছ, শাক-সবজি খেয়ে তছনছ করে। জঙ্গলে দলবদ্ধ একদল হাতির নিকট হতে ভয়ের বিশেষ কারণ নেই কিন্তু একটি মাখনা হাতির সামনে পড়লেই বিপদের সম্ভাবনা অত্যধিক। অকারণেই সে মানুষের দিকে তেড়ে আসে।

পশ্চিমবঙ্গের কোনো মন্ত্রী বলেছিলেন: আমরা হাতির হাত থেকে বাঁচতে চাই, ফসল রক্ষা করতে চাই ইত্যাদি।

গ্রামের পর গ্রাম ফসল ধ্বংস হয়ে যাবার জন্য হাতির পাল কি সত্যিই দায়ী? আর পাঁচটা প্রাকৃতিক সম্পদের মত হাতিও দেশের কাছে এক মহা সম্পদ। ঐতিহাসিক কাল থেকেই আমরা দেখে আসছি হাতিকে মানুষ নানাভাবে নিজের উপকারে লাগিয়েছে। এমনকি ধর্মের কাজেও তার ব্যবহার কম নয়। ভারতীয় শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্যে তার উল্লেখ বরাবরই দেখা যায়। কাজেই জাতীয় ক্ষেত্রে হাতি মূল্যবান সম্পদ। ফলে দিনের পর দিন মানুষের সাংঘাতিক ক্ষতি করলেও হাতির পালকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায় না। তার ক্ষতি না করেই মানুষের সহায় সম্পদ বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

আমাদের দেশের হাতির সম্মুখের দাঁত (গজদন্ত) ঈষৎ বাঁকানো, দৈর্ঘ্য পাঁচ হতে ছয় ফুটের মধ্যে এবং ওজনে প্রায় সত্তর-আশি পাউণ্ড। আফ্রিকার দেশের হাতির গজদন্ত আরো বড় এবং যথেষ্ট পরিমাণে বাঁকানো।

হাতিরা কি করে ঘুমোয়?

বাচ্চা হাতি বসে বসে ঘুমায় কিন্তু বড়রা সাধারণত বড় গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমায়। কারণ বসে বসে ঘুমালে বাঘ বা অন্য জন্তু আক্রমণ করলে এত বড় দেহটাকে নাড়াচাড়া করতে অনেক সময়

লাগে। তাই দাঁড়িয়ে ঘুমানোর ব্যবস্থা।

রাত্রিবেলা খাদ্যের সন্ধানে মাঝে মাঝে এবং দল বেঁধে লোকালয়ে নেমে আসে। ধান আর আখ এদের প্রিয় খাদ্য। কলা গাছ খেতে এরা খুব ভালবাসে। ঘন বনের শীতল ছায়ায় এরা দুপুর কাটায়।

হাতির শরীরে কোন লোম নেই। মোটা চামড়া ও চামড়ার তলায় পুরু চর্বির আস্তরণ। ফলে গরমে হাঁসফাঁস করে। তাই জলে স্নান করতে আর কাদায় ডুবে থাকতে এরা খুব ভালবাসে।

হাতি মানুষের মতনই বাঁচে—সত্তর হতে একশ' বছর পর্যন্ত। হাতির কান দেখলে তার বয়স নির্ণয় করা যায়। বৃদ্ধ হলে হাতির দেহ একেবারেই ভেঙে পড়ে, চামড়া ঝুলে যায়। ঐ অবস্থায় বনের এই বিরাট প্রাণীকে দেখলে মনে করুণা জাগা স্বাভাবিক। বৃদ্ধ হলেই মানুষের মত স্বাভাবিকভাবেই হাতির মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে হাতি জল বা জলাশয়ের ধারে গমন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমি যখন সেনা-বিভাগে কর্মে নিযুক্ত ছিলাম, কার্যোপলক্ষে আমাকে অনেক সময় গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তখন আমি অনেক হাতিকে ডোবা অথবা ঝরণার ধারে অর্ধ নিমজ্জিত অবস্থায় মৃত দেখেছি।

পাহাড়ী লোকেরা সেই মৃত হাতির গজদন্ত সংগ্রহ করে রাখত এবং উচ্চমূল্যে বিক্রয় করত।

১৯৪৭ সনে ভারত স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার পূর্বে ভারতের বনজঙ্গলে শিকারের বিশেষ কোনো নিয়ম-কানুন ছিল না। যে-যেভাবেই পারত বন্য জীবজন্তু মেরে শিকারের আনন্দ উপভোগ করত। হাতিরাও এর হাত থেকে রেহাই পেত না। ফলে অনেক জীবজন্তু ভারতের জঙ্গল হতে লোপ পেতে থাকে। যেমন ধর, সারা ভারতে চিতা (Cheeta) আছে কিনা সন্দেহ। চিতা (Cheeta) এবং চিতাবাঘ (Leopard) কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা জন্তু। এখনো ভারতে কিছু চিতাবাঘ (Leopard) আছে।

আর একটি প্রাণী গোল্ডেন ক্যাট্ (Golden Cat)। পঞ্চাশ

বছর পূর্বে কাছাড়ের জঙ্গলে প্রচুর Golden Cat দেখা যেত, এখন নাই বললেই চলে।

গোল্ডেন ক্যাট্ দেখতে এক জাতীয় বুনো বিড়ালের মত। রাতের অন্ধকারে মনে হয় ঠিক ছোট জাতীয় রয়েল বেঙ্গল টাইগার, আকারে একটি হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ কুকুরের মত। অনায়াসে গাছে উঠতে পারে। পাখির ডিম, হাঁস, মুরগী, খরগোস এদের প্রিয় খাদ্য।

হাতি নিধন করা একটু শক্ত। তাই হাতি মেরে বা খেদা করে ধরে হাতির বংশ নিঃশেষ করা যায়নি। উপরন্তু বর্তমান ভারত সরকারের কৃপায় বন্য জীবজন্তুর রক্ষার কিছু ব্যবস্থা হয়েছে।

হাতির বিরাট কুলোর মত কানের সামনে ছোট দু'টো চোখ—মিট্ মিট্ করে তাকায়, দৃষ্টিশক্তি খুব ক্ষীণ। পঞ্চাশ ফুটের বেশি দেখতে পায় না। তবে এদের ঘ্রাণশক্তি এত প্রবল যে এক মাইল দূরে অবস্থিত শত্রু বা মানুষের গন্ধও এরা পায় বলে জানা গেছে। এবং বনভূমি সংলগ্ন চা শিল্পাঞ্চলের আদিবাসী শ্রমিকদের ঘরে হাঁড়িয়ার খোঁজেও হানা দেয়। হাঁড়িয়ার উগ্রগন্ধ হাতি বহুদূর থেকে পায়।

এত বড় প্রাণী, মানুষ তাকে বন হতে ধরে এনে পোষ মানায় এবং কয়েক মাসের মধ্যে পোষ মেনে যায়।

সাধারণত বুনো হাতির দলকে নানা কৌশলে গড়ে নিয়ে এসে বন্দী করা হয়। আবার জঙ্গল পিটিয়ে হাতির দলকে গড়ে এনে আস্তে আস্তে পোষ মানানো হয়। ঐসব খেদায় পুরুষ স্ত্রী, হাতি, বাচ্চাসহ সবাই ধরা পড়ে।

সন্তানের প্রতি হস্তী ও হস্তিনী খুব স্নেহ-প্রবর। প্রসবের সময় হস্তিনী দলবলসহ নিরাপদ স্থানে নেমে আসে আর চারিদিকে পুরুষ হাতিরা বেষ্টনী তৈরী করে পাহারা দেয়, বাঘ বা অন্য কোনো হিংস্র জন্তুর হাত থেকে সন্তানকে রক্ষা করার জন্য। হাতির কচি-বাচ্চা বাঘের অতি প্রিয় ও লোভনীয় খাদ্য। হস্তিনী বাইশ মাসে সন্তান প্রসব করে।

হাতি খুব পরোপকারী ও ভীষণ বুদ্ধিসম্পন্ন। কেউ তার অপকার করলে সে তার প্রতিহিংসা নেয় বটে তবে উটের মত এরা তত প্রতিহিংসাপরায়ণ নয়। আবার কেউ উপকার করলে হাতি কৃতজ্ঞতার ভাব প্রকাশ করে। উপকারীর উপকার স্বীকার করা হাতির নিজস্ব ধর্ম। এ নিয়ে প্রচুর গল্প প্রচলিত আছে। আমি নিজেও স্বচক্ষে এরূপ বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।

একটি ছোট ঘটনা।

আমার বয়স তখন বছর আটেক। কাছাড় জেলার আমেরখাল কাছারী (বর্তমান রাজারামপুর) বাড়ির বারান্দায় বসে আমি পড়াশুনা করছি।

বছর দেড়েকের শিশুকে বারান্দার দোলনায় শুইয়ে রেখে আমার বড় বৌদি গিয়েছেন স্নান করতে। আমি একাগ্রচিত্তে পড়াশুনায় মগ্ন। এমন সময় একটা পাগলা কুকুর শিশুটির প্রায় নিকটবর্তী হয়। এই কুকুরটি কিছুদিন যাবৎ গ্রামে উৎপাত করে বেড়াচ্ছিল। বহু চেষ্টা করেও কুকুরটিকে মারা যায়নি।

দোলনা হতে খানিকদূরে আমাদের উঠোনের একপাশে হস্তিনীটি বাঁধা ছিল। পোষা হাতিকে যে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে, হাতি অনায়াসে সে-দড়ি ছিঁড়ে ফেলতে পারে। দড়ি দিয়ে বাঁধার উদ্দেশ্য— তুমি এখান হতে কোথাও যাবে না, এই নির্দেশ।

বাড়ির উঠোনে বিছানো ছিল রান্না করার আধ-ভিজা কাঠ। পাগলা কুকুরের মতি গতি লক্ষ্য করে হস্তিনী হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে কুকুরকে একখণ্ড কাঠের চেলা দিয়ে এমন জোরে আঘাত হানে যে, কুকুরটি কেঁউ কেঁউ চিৎকার করে মারা যায়। বড়বৌদি না-আসা পর্যন্ত হস্তিনী শিশুটিকে পাহারা দিতে থাকে।

আবার অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে, মাহুত দিনের পর দিন হাতিকে পরিপূর্ণ খাদ্য সরবরাহ করে নাই। সে হাতির খাদ্যের কিছু অংশ বিক্রি করে হাতিকে উপবাসী রেখেছে। হাতি এ অবস্থাটা

বুঝতে পারলে একদিন ক্ষেপে গিয়ে মাহুতকে পায়ের তলায় পিষে প্রতিশোধ নেয়।

১৯৫৩ সনের নভেম্বরের শেষে পুরীর মন্দিরের সামনে স্বর্গোদ্বারের রাস্তায় রাজবাড়ির একটি হাতি মাহুতকে পিষে মারতে দেখি। সে এক বীভৎস্য দৃশ্য! অনুসন্ধানে জানা যায়—মাহুত হাতিকে নিয়মিতভাবে খেতে দিত না। হাতির খাদ্যের কিছু অংশ বিক্রি করে দিত। তার ফলেই মাহুতের এই পরিণতি।

আর একটি ঘটনা।

আসামের কাছাড় জেলার মানিকনগর চা-বাগানের জনৈক কর্মী ও একজন পুলিশ অফিসার একদিন নৈশ আহারের পর দেখতে পান যে, রান্নাঘরের পেছনে একটি বুনো দলছাড়া মাখনা হাতি নিশ্চিন্ত মনে কলাগাছগুলো ভেঙে তছনছ করছে। কলাবাগানে নানাজাতের কলা—মর্তমান, চাপা, কাঠালী, কাঁচাকলা ইত্যাদি।

রান্নাঘরের অবস্থান শোবার ঘর হতে একটু নিচু টিলাভূমিতে। দূরত্ব মাত্র একশ' গজের ব্যবধান। টিলার পর ঘন নলখাগড়ার বন। তারপরই গভীর জঙ্গল।

হৈ-হল্লা, টিন পিটিয়ে, আগুন জ্বালিয়ে হাতিকে তাড়িয়ে দেবার জন্য সবাই যখন জড় হয়ে হৈ-চৈ-এ মগ্ন, এমন সময় বাগানের একটি শ্রমিক হাতিকে লক্ষ্য করে একখণ্ড ইট ছুঁড়ে মারে।

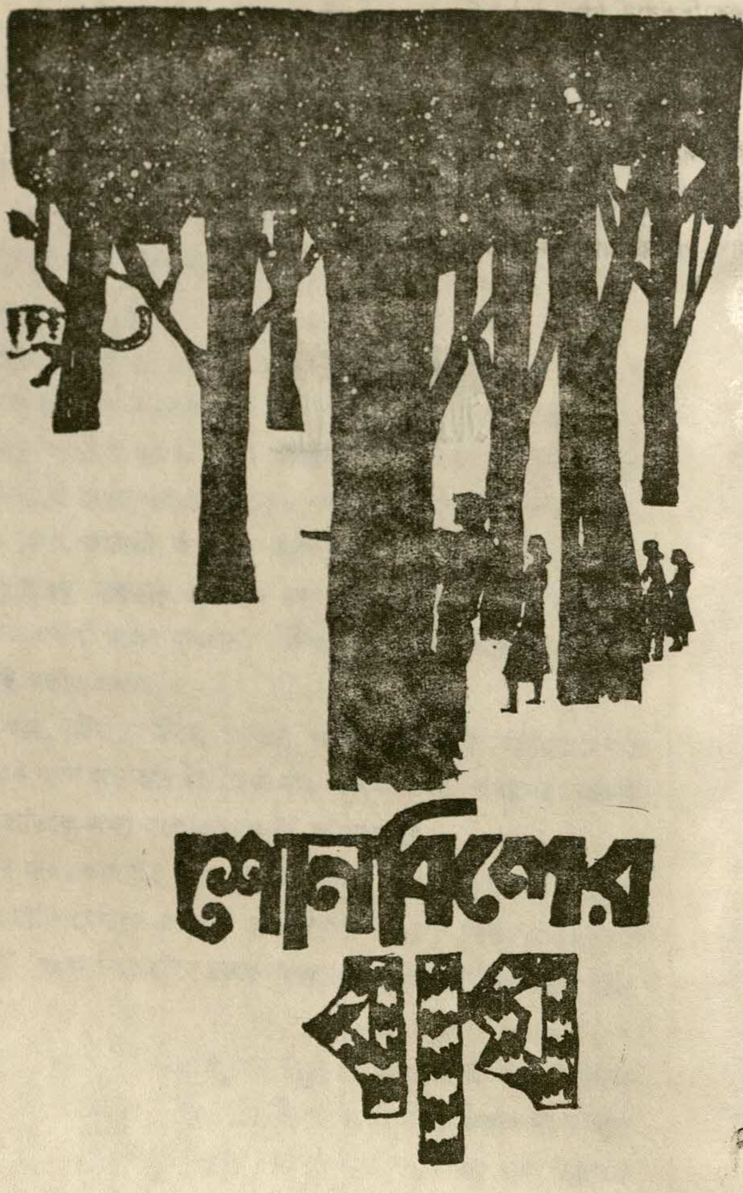
আর যায় কোথায়! রুখে দাঁড়াল হাতি। আগুন ও এতো লোকের সমাগমে হাতি বেশীদূর এগোতে সাহসী হয় না। কিন্তু যাবার সময় রান্নাঘরটি শুঁড় দিয়ে টেনে ভেঙে লণ্ডভণ্ড করে হাতি বনের দিকে চলে যায়।

পূর্বেই বলেছি হাতি সুদীর্ঘ দিন বাঁচে। এতো দীর্ঘ সময় বাঁচতে হলে প্রতিদিন হাতিকে মন মন লতাপাতা, ঘাস, জঞ্জাল দাঁত দিয়ে চিবুতে হয়। পাহাড়ী লোকেদের মুখে শোনা যায় প্রকৃতির নিয়মেই হাতির জীবনকালেই কয়েকবার দাঁত পড়ে এবং গজায়। সত্যিই

একাধিকবার দাঁত উঠে কিনা এ সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।

নিজের দেহের ওজন সম্পর্কে হাতি খুব সজাগ। কারণ কাঠের সেতু বা কর্দমাক্ত জায়গা পার হতে হাতি খুব ভয় পায় এবং খুব বুজেসুজে চলে। কুলের বীচি বা পাথরের শক্ত টুকরো পায়ের তলায় পড়লে যে ব্যথা পাওয়া যাবে সে-ব্যাপারেও হাতি খুব সজাগ।





লোকে বলে দেওধার কাছারী। কিন্তু জমিদারের কাগজপত্রে লেখা মানিকনগর।

শোনবিলের পারে অবস্থিত ছোট্ট একটি গ্রাম। দু'দিকে পাহাড়ে-ঘেরা সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশ।

বিলটি লম্বায় উত্তর-দক্ষিণে প্রায় বার মাইল ও পুব-পশ্চিমে সাত-আট মাইল বিস্তৃত। বিলের উভয় পারে চাষী ও জেলেদের বাস প্রচুর। বর্ষায় বিলের রূপ যেন বঙ্গোপসাগর আর শীতকালে জল শুকিয়ে একেবারে মরা গাঙের মত। তখন অজানা নানাজাতের পাখি বিলের চারপাশে আস্তানা গাড়ে।

দিনরাত পাখিদের কিচির-মিচির কলরবে ও জেলেদের মাছ ধরার হাঁকডাকে গ্রামটি তখন সদাই উৎফুল্লিত। পক্ষীবিশারদরা বলেন, খাদ্যের সন্ধানে এই পাখিগুলি নাকি আসে সুদূর সাইবেরিয়া ও হিমালয়ের ওপার হতে।

নানা জাতের নানা রঙের পাখি—রাজহাঁস, বেলেহাঁস, গাঙচিল, সরাইল কত কি!

আমার চতুর্থ ভাই স্বর্গত শুভেন্দুকুমার দত্ত তখন সরকারী কাজে মানিকনগরে অবস্থান করছেন। পূজার ছুটির পর একবার আমার তিনটি মেয়ে রুবি, বনা ও নবনীতাকে নিয়ে মানিকনগরে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

মেয়েদের বয়স যথাক্রমে বার, দশ ও ছয় বছর। রোজ বিকেলে ওদের নৌকা করে বিলে বেড়িয়ে নিয়ে আসতাম। জেলেদের মাছধরা ও অগণিত পাখির কলকাকলিতে ওরা মোহিত হয়ে যেত। জন্মসূত্রে ওরা কলকাতার মাটিতেই লালিতপালিত। কাজেই এই দৃশ্য ওদের কাছে অতি মনোমুগ্ধকর।

একদিন বিকেলে দাদার সট্‌গান্‌টা কাঁধে ফেলে মেয়ে তিনটি সহ নৌকা করে বিলের ধারে পাখি শিকারে বের হলাম। উদ্দেশ্য দু'একটা সরাইল পাখি নিধন করা। সরাইলের মাংস অতি সুস্বাদু।

আমার ভাইপো শ্রীমান বুদ্ধু আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য বায়না ধরল। ভয়ানক দুষ্টু ও চঞ্চল বলে ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বৌদি নিষেধ করলেন। তাছাড়া বিলের ধারে অথবা জঙ্গলের মধ্যে বুদ্ধু এমন দৃশ্যের অবতারণা করে যে, বন্যজন্তুর আক্রমণ হতে তখন আর বাঁচবার উপায় থাকে না। কারণ বুদ্ধু বাঘের অনুকরণে বাঘের মত ডাকতে পারে; হায়নার মতন আওয়াজ তুলতে পারে। ফলে বন্য বাঘ বা হায়না যদি জঙ্গলে থাকে, তাহলে সে ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসে।

কাজেই বুদ্ধুকে ফেলেই আমরা রওনা হলাম।

বিলের ধারে নৌকায় আমরা পাখির পেছনে পেছনে অনেক ঘুরলাম। কিন্তু একটিকেও গুলিবিদ্ধ করতে পারলাম না। কারণ যতবারই বন্দুকের ট্রিগার টানবার জন্য তৈরি হচ্ছি, ততবারই আমার কোনো না কোনো মেয়ে বলে উঠেছে: বাবা, ওটাকে আগে গুলি কর —ওই যে আর একটা ইত্যাদি।

ফলে পাখির ঝাঁক বার বারই অতর্কিতে উড়ে পালিয়েছে।

শিকারের নেশায় প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো। এ অবস্থায় আর বেশীদূর অগ্রসর হওয়া ঠিক নয় মনে করে তিনটি শিশুকে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার মনস্থ করলাম।

একজন পরিচিত জেলের ঘাটে নৌকাটি রেখে এলাম।

তাড়াতাড়ি ফিরতে পারব বলে নৌকা ছেড়ে হাঁটাপথে সোজা বাড়ি ফিরছি। ফেরার পথে খানিকটা জায়গা একটু গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আসতে হয়। তাই মেয়ে তিনটিকে তাড়াতাড়ি পা চালাতে বললাম।

নবনীতা বলল: বাবা, এ জঙ্গলে বাঘ নেই?

বললাম: নেই কিরে? সেজন্য তো তাড়াতাড়ি হাঁটতে বলছি।

দেখছিস না চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে প্রায়।

মেয়ে তিনটি যেন ভয়ে একটু কুঁকড়ে গেল।

বললাম : আরে ভয় কিসের? দেখছিস না সঙ্গে বন্দুক রয়েছে…। তোদের জেঠামণির ড্রইংরুমে যে বাঘের চামড়াটা রয়েছে, ওটা আমিই মেরেছিলাম।

আমার কথায় ওরা যেন বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল এবং সাহসে ভর দিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে এগোতে লাগল।

নিরাপদে জঙ্গলটা পার হয়ে একটু ঢালু জায়গায় সবেমাত্র আমরা একটি নালা পার হতে যাচ্ছি, এমন সময় সামনের সমতল টিলাভূমির ঝোপজঙ্গল হতে বাঘের স্পষ্ট গর্জন কানে এলো।

গুরু গুরু আওয়াজ। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আওয়াজ লক্ষ্য করলাম। হ্যাঁ আমাদের সামনের ডান দিকের ঝোপ হতেই আওয়াজটা আসছে।

হায় ভগবান! ঠাকুর! মেয়ে তিনটিকে বুঝি আজ আর বাঁচাতে পারলাম না। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিলাম। দু'নলা বন্দুকে এল জি কার্তুজ খুলে বুলেট ভরে নিলাম। শিকারে বেরুবার সময় দুটি বুলেট সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম।

মেয়ে তিনটিকে একটি গাছের আড়ালে দাঁড় করিয়ে চুপি চুপি বললাম : চিৎকার করবি না, কোনো ভয় নাই। দেখিস এক গুলিতে বাঘটাকে খতম করে দেব। এখান হতে তোরা এক পাও নড়বি না।

বন্দুকটা বাগিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে কয়েক পা এগিয়েছি। দেখি, টিলাভূমির একটি ছোট ঝোপের মধ্যে বাঘের অর্ধেক দেহ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মনে হল আট-নয় ফুট লম্বা বাঘ। খাঁটি রয়েল বেঙ্গল।

বিরাট বাঘ। সন্ধ্যার ঝাপসা অন্ধকারে বাঘটিকে শুয়ে থাকতে দেখলাম। বাঘটি কট্‌মট্‌ করে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে আর রাগে লেজটি নাড়াচ্ছে। এখনি হয়তো আমাদের উপর লাফিয়ে পড়বে।

একটি গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে যেই ট্রিগার টানতে যাব, অমনি বাঘটি লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বলে উঠল : চিনিকাকা, আমি বুদ্ধু।

ভাইপোরা আমাকে চিনিকাকা বলে ডাকে।

স্তব্ধ হয়ে গেলাম। হাত-পাগুলো অবশ হয়ে এলো। দেহটি তখনও আমার কাঁপছে। মনে হ'ল কয়েক সেকেণ্ড যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি।

…ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছেড়ে গেল। ভাগ্যিস ট্রিগার টানিনি। তাহলে আজ এক অঘটন ঘটে যেত। ভাইপো হত্যার দায়ে চিরকাল কলঙ্কিত হয়ে থাকতাম।

ইচ্ছা হচ্ছিল খুব জোরে এক চড় কষিয়ে দেই ওর গালে। কিন্তু ওর সাহসকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম।

মেয়ে তিনটি প্রথমে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল। এবার আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বলল : বুব্ধুদা, জেঠামণির ড্রইংরুম হতে বাঘের চামড়াটি পরে তুমি আমাদের ভয় দেখাচ্ছ ?

নবনীতা বলে উঠল : বাবা, তাহলে ওটা সত্যিকারের বাঘ নয়! বুব্ধুদাকে আমাদের সঙ্গে নাওনি বলে ও আমাদের ভয় দেখাচ্ছে।

কৌতুক ও দুশ্চিন্তা উভয় নিয়েই বাড়ি ফিরলাম।



বাঘ আমাদের প্রতিবেশী—তাকে বাঁচতে দিন



এশিয়া ছাড়া কোথাও বাঘ নাই। অবশ্য আফ্রিকায় চিতা (Cheeta) ও চিতাবাঘ (Leopard) আছে।

বাঘকে দেখতে যেমন সুশ্রী তেমন সুঠাম, সুগঠিত তার দেহ—শক্তিমান ও অত্যন্ত সাহসী। পৃথিবীর মধ্যে রয়েল বেঙ্গল টাইগারই সবচেয়ে দেখতে সুন্দর, গায়ের রঙ বাদামী-কালো ডোরায় ভরা।

রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চল বাঘের আদি জন্মস্থান। সেখান হতে ক্রমে মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, চীন, ব্রহ্মদেশ, ভারত, থাইল্যাণ্ড, ভিয়েৎনাম, মালয়, ইন্দোনেশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। শ্রীলঙ্কায় কোন বাঘ নেই। হিমালয়ের নয় হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত বাঘ দেখা যায়।

জোয়ান ও স্বাস্থ্যবান বাঘের দৈর্ঘ্য সাধারণত নয় ফুটের বেশি লম্বা হয় না—লেজ সাড়ে তিন ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। মাথা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত মেপে বাঘের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হয়। পূর্বে বার ফুট পর্যন্ত লম্বা বাঘ দেখা যেত। এখন দশ ফুট লম্বা বাঘের সন্ধান পাওয়াই দুষ্কর।

আমার ছোটবেলায় দেখেছি—কাছাড়ের সুপরিচিত কর্মবীর স্বর্গত খগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত যিনি পূর্ববঙ্গ হতে আগত মানুষদের জন্য রামকৃষ্ণনগর নামক এক ছোট শহরের পত্তন করে গিয়েছেন, তিনি একবার দশ ফুট এগার ইঞ্চি লম্বা একটি বাঘ শোলবিলের পুব পাহাড়ে শিকার করেছিলেন।

বাব্বা! সে বাঘ দেখলেই হৃদয়ের স্পন্দন একেবারে চুপসে যায়।

একটি পূর্ণ বয়স্ক বাঘের ওজন ৩২৫ কেজি। উচ্চতা সাধারণত সাড়ে তিন ফুট। উচ্চতার তুলনায় বাঘ লম্বায় বেশি হয়। সুমাত্রার বাঘের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম। বাঘ পঁচিশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

পাঁচ বছর বয়সে বাঘ পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হয়।

বাঘিনী তিন মাস দশ দিন গর্ভ ধারণ করে। একসঙ্গে তিন-চারটি বাচ্চা প্রসব করে। নবজাত শাবকের ওজন সাধারণত দেড় কেজি। নয় দিনের দিন চোখ ফোটে। কিন্তু ভাল দেখতে পায় না। সপ্তাহ দুই পরে দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক হয়।

শিশু অবস্থায় বাচ্চা বাঘের গায়ের রঙ হালকা হলুদ। শাবক যত বড় হতে থাকে, গায়ের রঙ ততই উজ্জ্বল হয়।

প্রসবের পর বাঘিনী তার বাচ্চাদের দুধ খাওয়াতে থাকে। কান দু'টি কিন্তু তার সবসময়ই সজাগ। 'খুট্' করে শব্দ হলেই গ্রীবা উত্তোলন করে চারদিকে দৃষ্টি হানে। সামান্য সন্দেহ হলেই গর্জন করে তীব্র বেগে শত্রুর দিকে ধাবিত হয়।

বাঘের স্বভাব-চরিত্র, আকৃতি-প্রকৃতি ঠিক হুবহু বিড়ালের মত। সন্তান প্রসব করার পর বাঘিনী শাবকদের বাঘ থেকে দূরে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যায়। বিড়ালের মত বাঘও অনেক সময় দু'একটি পুরুষ শাবকও খেয়েফেলে।

বিড়ালের বাচ্চা বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে মা আরশোলা বা টিকটিকি ধরে বাচ্চাদের সামনে রাখে এবং খেলাচ্ছলে বাচ্চাদের শিকার ধরার কৌশল শিখিয়ে দেয়। বাঘিনীও অনুরূপ পদ্ধতিতে খরগোস বা হরিণ শিশু ধরে এনে (না মেরে) সন্তানদের সামনে ফেলে দেয়।হরিণ শিশু পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে বাঘিনী সন্তানদের ধরে আনার নির্দেশ দেয়।

বাঘ শক্তিমান জন্তু। বাঘের গতি এত ক্ষিপ্র ও নীরব যে টের পাবার পূর্বেই শিকার তার থাবার মধ্যে। বাঘ অনায়াসে বলিষ্ঠতম মোষকেও হত্যা করতে পারে।

প্রথমে সে ওৎ পেতে বসে থাকে। তারপর অতর্কিতে শিকারের ঘাড়ের নিচে সে কামড়ে ধরে আর সামনের থাবা দিয়ে তার পিঠের উপর চেপে ধরে। তারপর দাঁত বসিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ঘাড়টি মুচড়ে দেয়, আর

সেটা ভেঙে যায়। ঘাড় ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই শ্বাসনালিটি ছিঁড়ে ফেলে দেয় যাতে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে প্রাণীটির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

ভারী ভারী গরু বা মোষকে উঁচু পাহাড়ের চড়াই দিয়ে হিচড়ে টেনে নিয়ে যায়।

বাঘ কিন্তু গাড়ি টানতে পারে না। কারণ বাঘের মাংসপেশীতে ধাক্কা মারার শক্তি প্রচণ্ড, কিন্তু ভার বইবার শক্তি নেই।

ক্ষুধার্ত বাঘের খাওয়া-দাওয়ার কোন বাছবিচার নেই। যে-কোনো প্রাণীর মাংস সে খায়। প্রয়োজন হলে মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি খায়। মাছরাঙার মত জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাছ ধরতে বাঘকে আমি দেখেছি। মাংস একবারে পঁচিশ থেকে ত্রিশ কেজি পর্যন্ত খেতে পারে।

প্রতিদিন বাঘের আহার জোটে না। আহারের জন্য তাকে খুব পরিশ্রম করতে হয়। যে রাত্রে শিকারে বের হয়, সে রাত্রিতে বাঘকে পনের-বিশ মাইল রাস্তা হাঁটতে হয়। একটি স্বাস্থ্যবান গরু বা মোষ শিকার করলে, দশ দিনের মধ্যে বাঘের আর শিকারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু হরিণ বা ঐ রকম ছোট প্রাণী মারলে দু'তিন দিন পরেই তাকে আবার আহারের সন্ধানে বের হতে হয়।

লোকের একটি ভুল ধারণা আছে যে, বাঘ শুধু নিজের শিকারের মাংস খায়। বস্তুত মরা, পচা মাংস জঙ্গলে দুষ্প্রাপ্য ; এজন্য দিনের বেলা শকুন ও রাত্রিবেলায় শৃগাল, হায়না, নেকড়ে প্রভৃতি জন্তু কোনো কিছু পড়ে থাকতে দেয় না। কাজেই বাঘের ভাগ্যে নিজের শিকারের মাংস ছাড়া অন্য মাংস পাবে কোথায়। তবে এটা ঠিক বাঘ তার নিজের শিকারের টাটকা মাংস খেতেই ভালবাসে।

বাঘ শিকার করে সঙ্গে সঙ্গেই কিছুটা অংশ খেয়ে নেয়। তারপর ঘণ্টা কয়েক পরে মাংস যখন নরম হয় তখন অবশিষ্ট অংশ খায়। যা কিছু পড়ে থাকে তা কোনো সুরক্ষিত জায়গায় রেখে দেয়। শৃগাল, হায়না, নেকড়ে প্রভৃতি কোনো প্রাণী ভয়েই সেসব সুরক্ষিত জায়গায় প্রবেশ করতে সাহস পায় না।

বাঘের জিহ্বা ভয়ানক খসখসে। বাঘের ঘ্রাণ, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। বাঘ সাধারণত গাছে উঠতে পারে না; বিপদের সময় বা বন্যায় যখন চারদিক ভেসে যায় তখন কোনো কোনো বাঘকে নরম হেলান গাছে খানিকটা উঠতে দেখা গিয়েছে। চিতাবাঘ (Leopard) কিন্তু অনায়াসে গাছে উঠতে পারে এবং ঘন লতাপাতার আড়ালে লুকিয়ে থেকে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বাঘ খুব ভাল সাঁতার কাটতে পারে। গ্রীষ্মকালে অর্ধ-নিমজ্জিত অবস্থায় বাঘকে দেখা যায়। বাঘ যখন রেগে যায় অথবা খুশি হয় তখন বাঁ দিক হতে ডান দিকে লেজটি দোলাতে থাকে।

বাঘের নখ অত্যন্ত ধারালো ও শক্ত। বিড়ালের মত ওরা থাবা গুটাতে পারে ও প্রয়োজনবোধে গাছের গুঁড়িতে নখ ধার করে নেয়।

বাঘের গতি এত ক্ষিপ্র ও নীরব যে টের পাবার আগেই অধিকাংশ সময় শিকার তার থাবার মধ্যে। বাঘ যখন দোতলা-সমান উঁচু ঘাস বা ছন্ ক্ষেতের (আসামে ছন্ দিয়ে ঘরের ছাউনী হয়) মধ্য দিয়ে যায়, তখন ঘাসের ডগা একটুও নড়ে না। রাবারের মত নিজের দেহকে অনেকটা বাড়িয়ে নিতে পারে।

খাওয়া-দাওয়ার পর বাঘ বাঁশঝাড়ের নিচে গাছের ছায়ায় অথবা নিজের দেহের রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শুকনো পাতার মাঝে নিদ্রা যায়। দিনের বেলায় সে এইভাবেই আত্মগোপন করে।

বাঘেদের কোনো বিধান ডাক্তার বা মেডিকেল কলেজে নেই। গুলিবিদ্ধ আহত বাঘ বা কোনো কারণে বাঘের দেহের কোনো অংশ ক্ষত হলে জিব দিয়ে লেহন করে প্রাকৃতিক নিয়মে বাঘ ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠে। মুখের গালা ও লেহনই একমাত্র মহৌষধ। কিন্তু ঘাড়ে বা পিঠে ঘা হলে সে জিব দিয়ে লেহন করতে পারে না, ফলে ক্রমে ক্রমে সেপ্‌টিক্ হয়ে সে মারা যায়।

বাঘ গোলমাল, লোকের ভীড় বা সূর্যের আলো একেবারেই পছন্দ

করে না। সেজন্য ওরা দিনের বেলায় নিদ্রা যায় ও রাত্রে আহারের সন্ধানে বের হয়।

গাছের উপর যদি কাক অথবা বানর থাকে, বাঘ গাছের নিচ দিয়ে গেলেই কাক বা বানর কিচিরমিচির শব্দ করে বনের অন্য প্রাণীদের সজাগ করে দেয়। বাঘ দেখলেই চিতল হরিণও ডাকে।

বাঘ দেখে বানরেরা কিচিরমিচির বা লাফালাফি করতে থাকে, তখন এক-এক সময় বাঘ রেগে গিয়ে এমন গর্জন করে যে, পূর্ণ-বয়স্ক ভীতু দু'একটা বানর এবং সাধারণত বাচ্চাগুলো ভয়ে গাছ হতে মাটিতে পড়ে যায়। বাঘ তখন নির্বিবাদে ওদের ভক্ষণ করে।

জঙ্গলের বাসিন্দারা বলেন, বাঘ যখন শিকারের সন্ধানে বের হয়, তখন শিয়াল 'হুয়াক্কা হুয়া' না ডেকে 'ফেউ-উ' শব্দে ডাকতে থাকে। বাঘের আগমন-বার্তা অন্য প্রাণীদের জানিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য। ফেউ-এর ডাক শুনে বাঘ বিরক্তে অন্য পথে গমন করে।

বাঘ যখন শিকারের কিছু অংশ খেয়ে বিশ্রাম করে, তখন অনেক সময় পাঁচ-ছয়টি শিয়াল একসঙ্গে আসে, আর পর পর দূরে লুকিয়ে থাকে। প্রথম শিয়াল এক খাবলা মাংস টেনে দ্বিতীয় শিয়ালকে দেয়। দ্বিতীয় শিয়াল তৃতীয়কে। এভাবে অতি সন্তর্পণে শিয়ালদের গর্তে মাংস সরবরাহ হয়। পরে সবাই একত্র হয়ে খায়। বাঘ আসার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে পালায়, এ-তল্লাটেও ওদের টিকি দেখা যায় না।

বাঘ যতই সাহসী হোক, বন্য কুকুর থেকে দূরে থাকে। বন্য কুকুররা সাধারণত দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে। বাঘ ও বন্য কুকুরে লড়াই বাঁধলে, বাঘের থাবায় হয়তো চার-পাঁচটা কুকুর খতম হয়ে গেল। কুচ্ পরোয়া নেই। শেষ কুকুরটি পর্যন্ত বাঘের সঙ্গে লড়ে যায়। ফলে বাঘ কাবু হয়ে পড়ে। বন্য কুকুররা দলে একসঙ্গে কুড়ি-পঁচিশটি থাকে।

তেমনি ঠেকায় না পড়লে বাঘ কখনও সজারুর পিছনে ধাওয়া করে না। সজারু শিকার করার সময় তার কাঁটা বাঘের পায়ে বিঁধে যায়। সেই কাঁটার ঘা শুকোতে অনেক সময় লাগে। ঘা শুকোলেও বাঘ

তার স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতা হারিয়ে ফেলে।

বাঘ ও সিংহের শিকার-কৌশলে অনেক পার্থক্য আছে। সিংহ অনেক দূর থেকে গর্জন করতে করতে শিকারকে সামনাসামনি আক্রমণ করে। সেই কারণে সিংহ ঘাস-বিছানো অঞ্চল বা ছোট ছোট গাছের জঙ্গলে থাকতে পছন্দ করে। বাঘ নিজেকে লুকিয়ে রেখে নিঃশব্দে এক ঝোপ থেকে অন্য ঝোপে যেতে থাকে এবং যতটা সম্ভব শিকারের কাছে গিয়ে শেষ মুহূর্তে গর্জন করে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এজন্য বাঘ ঘন গভীর জঙ্গলে বা ঝোপঝাড়বিশিষ্ট অঞ্চলে থাকতে সুবিধা বোধ করে। সিংহ পরিবার নিয়ে অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র, নাতি-নাতনি সহ ঘুরে বেড়ায় ও শিকার করে। বাঘ কিন্তু খুব আত্মকেন্দ্রিক, একা থাকতে ও একা শিকার করতে ভালবাসে। বাঘের মত সাহসী, বলশালী, কৌশলী ও ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন প্রাণী আর নাই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমি যখন সেনাবিভাগে সহকারী লিয়াজন অফিসার ছিলাম, তখন প্রসিদ্ধ শিকারী ও পশু-প্রেমিক জিম করবেটের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মেশার সুযোগ আমার ঘটেছিল। ই. পি. জী-র সাথেও জঙ্গলে রাত কাটাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

তাঁরা বলেন: 'বাঘ কখনও মানুষ খায় না।' অভিজ্ঞ শিকারীরাও এই মত পোষণ করেন। আমিও তাঁদের সাথে একমত।

বাঘ যখন বৃদ্ধ হয়, ক্ষিপ্রগতিতে বন্যপ্রাণী তাড়িয়ে শিকার করতে পারে না। তখন সে লোকালয়ে এসে গরু-বাছুর, মানুষ ধরে খায় অথবা গুলিবিদ্ধ আহত বাঘ আক্রোশবশতঃ মানুষের উপর হিংসাভাব পোষণ করতে থাকে। একবার মানুষের রক্তের আস্বাদ পেলে, সে মানুষখেকো হয়ে উঠে।

সুন্দরবনের অধিকাংশ বাঘই মানুষখেকো। বংশ-পরম্পরায় ওরা মানুষখেকো হয়ে উঠেছে। আমার মতে—সুন্দরবন অঞ্চলে হরিণ বা অন্যান্য প্রাণী লোপ পাওয়ায় ও ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য হিমালয়ের পাদদেশের পার্বত্য অঞ্চল হতে বিচ্ছিন্ন থাকায় অর্থাৎ সুন্দরবন হচ্ছে

হিমালয়ে যাওয়ার কোন পার্বত্য রাস্তা নেই। ফলে সুন্দরবনের বাঘ স্বভাবতই মানুষখেকো।

অভিজ্ঞ লোকেরা বলেন, স্থলচর মাংসাশী প্রাণী দীর্ঘায়ু হয় না। সেজন্য বাঘ ২৫ বছরের বেশি বাঁচে না। তৃণভোজী স্থলচর প্রাণীরা দীর্ঘায়ু হয়। যেমন হাতি ও গণ্ডার তৃণভোজী প্রাণী। সেজন্য হাতি ৭০ হতে ১০০ বছর এবং গণ্ডার ৭০ হতে ৮০ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে।

বাঘ-শিকার খুবই উত্তেজনাপূর্ণ।

আমাদের বাল্যকালে দেখেছি রাজা-মহারাজা, বর্ধিষ্ণু গণ্যমান্য ব্যক্তি বা ইংরেজ সরকারের রাজকর্মচারীরা মাচা বেঁধে অথবা হাতির পিঠে চড়ে জঙ্গল পিটিয়ে রাইফেল কাঁধে বাঘ শিকার করতেন।

আর গরিব চাষী বা পাহাড়ী লোকেরা বীর পুরুষের মতন জালে বাঘ তাড়িয়ে এনে বল্লম দিয়ে হত্যা করত।

প্রায় ষাট বছর পূর্বে আমি আসামে সিলেট ও কাছাড় অঞ্চলে জালে বাঘ তাড়িয়ে এনে মারতে দেখেছি। তখন ছিল স্বদেশী যুগ। তাই ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সবাইকে বন্দুকের লাইসেন্স অনুমোদন করতেন না। রাজা-মহারাজা ও গ্রামের বর্ধিষ্ণু লোক ছাড়া কেহই বন্দুকের লাইসেন্স পেতেন না। আসামে তখন বাঘ ও বন্য জন্তুর উৎপাত ছিল যথেষ্ট। আমি নিজেই আমাদের বাড়ির গোয়ালঘর হতে বাঘে গরু ধরে নিতে বহুবার দেখেছি।

বাঘকে কিভাবে জালে ফেলা হত ?

গরিব চাষীর বয়েলটিকে হয়তো বাঘে নিয়ে গেল। চাষীর পক্ষে বয়েলের মূল্য অনেক।

প্রথমে গ্রামের দক্ষ লোকেরা গিয়ে দেখে আসত বাঘ বয়েলটিকে কোথায় নিয়ে রেখেছে। সেই অঞ্চলটা তখন গ্রামের সাহসী লোকেরা নিঃশব্দে ঘিরে রাখত। আর সামনের জঙ্গল জাল দিয়ে ঘেরাও করত। জাল শন বা পাটের তৈরি। বেশ পোক্ত।

জাল পাতা হয়ে গেলে—সবাই মিলে হৈ-হল্লা করে, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তাড়া করে এনে বাঘকে জালে ফেলত। তারপর বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হত। গরিব চাষীদের বন্দুক না থাকার ফলে বোধহয় এই ব্যবস্থা। অনেক সময় বাঘ জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ত। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য!

বর্তমানে চোরাগুপ্তা বাঘ শিকারের আধিক্য দেখে আশঙ্কা হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে ভারতের জঙ্গলে আর হয়তো বাঘই দেখা যাবে না। সেজন্য বর্তমান ভারত সরকার আইন করে শিকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং সারা ভারতে অভয়ারণ্য তথা ব্যাঘ্র প্রকল্পের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন।

বাঘ আমাদের দেশ থেকে লোপ পেলে প্রকৃতির এক আশ্চর্য সুন্দর সৃষ্টিকে আমরা হারাব। কাজেই ব্যাঘ্র প্রকল্পগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য।



বাঁদর খালের বাঘ



বান্দরখাল।

আসামের কাছাড় জেলার বদরপুর হতে দামছড়া ছাড়িয়ে পাহাড় লাইনের গভীর অরণ্যে অবস্থিত ছোট স্টেশন। চারদিক পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা নানা জাতের গাছ আর ঝোপঝাড়ের বন।

বান্দরখাল অঞ্চলে নানাজাতীয় বানর ছাড়া রয়েছে প্রচুর হাতি, বাঘ, ভালুক ও বিষধর সাপ। বিভিন্ন জাতের বনবিড়ালও দেখা যায়।

পঞ্চাশ বছর আগেও এই অঞ্চলে গোল্ডেন ক্যাট্ (Golden Cat) নামে একজাতীয় বুনো বিড়াল দেখা যেত। রাতের অন্ধকারে মনে হত ঠিক যেন ছোট জাতীয় রয়েল বেঙ্গল টাইগার। আকারে একটি হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ কুকুরের মত। অনায়াসে গাছে উঠতে পারে। এদের প্রিয় খাদ্য ডিম, হাঁস, মুরগী ও খরগোস।

এই অঞ্চলে নাগা, কুকি, কাছাড়ীরা আশপাশের গ্রামে ছাড়িয়ে আছে। বিক্ষিপ্ত গ্রাম।

দিনের বেলায় দেখা যায় স্ত্রী-পুরুষেরা একসাথে বড় বড় রাম-দা হাতে চলাফেরা করে। পাহাড়ের ঢালু-খাতে ওরা চাষ-আবাদ করে। তর্‌তর্‌ করে পাহাড় টপকিয়ে এক গ্রাম হতে আর এক গ্রামে যায়। সমতলের মানুষ আমরা—হেঁটে ওদের নাগাল ধরতে পারি না।

কাঠ সংগ্রহ করে, সমতল ভূমির গ্রামাঞ্চলে বিক্রি করে। অল্পতেই ওরা তুষ্ট। অতি সরল ও সহজ মানুষ ওরা।

জঙ্গলের পথে বাঘ-ভালুকের সাথে ওদের দেখা সাক্ষাৎ হয় প্রায়ই। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। কখনও বাঘ বা ভালুক মারা যায়, আবার কখনও পাহাড়ী মানুষকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। এভাবেই ওরা জীবনযাপন করে।

সবেমাত্র তখন বদরপুর হতে লামডিং পর্যন্ত রেল লাইন চালু হয়েছে।

পাহাড় লাইনে এই পথে বত্রিশটি সুড়ঙ্গ পেরিয়ে হাফলং ছাড়িয়ে কু-ঝিক্ ঝিক্ করে গাড়ি লামডিং পৌছায়। চারিদিকের দৃশ্য অপূর্ব। দিনে-রাতে মাত্র চারটি ট্রেন যাতায়াত করে। শোনা যায়, সেসময় মাঝে মাঝে হাতিরদল সুড়ঙ্গ-পথ অবরোধ করে দাঁড়াত। ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হত।

আমার পিসেমশাই ছিলেন বান্দরখাল স্টেশনের স্টেশন-মাস্টার।

পিসেমশাই, বুকিং ক্লার্ক সুশান্তবাবু, তু'জন পয়েন্টসম্যান ও তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে এই বান্দরখাল স্টেশন। আশেপাশে আর জনমানব নেই। কিছু দূরে অবশ্য বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাহাড়ীদের ঘড়বাড়ি চোখে পড়ে।

দিবাভাগে পাহাড়ী মানুষেরা ট্রেনে চড়ে শহরাঞ্চলে যায়। সন্ধ্যার ট্রেনেই বাড়ি ফেরে। রাতের বেলায় সাধারণত কেউ চলাফেরা করে না। কারণ রাতের অন্ধকারে বনের পথ অতি তুর্গম ও বিপজ্জনক। কোন্ ঝোপঝাড়ে মানুষখেকো বাঘ ওৎ পেতে আছে কে জানে? ভালুক হয়তো মধুর সন্ধানে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পিসেমশাই ছিলেন খুব নামকরা শিকারী। কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন আসামের জঙ্গলে।

আমরা তু'ভাই। আমি আর শুভেন্দু। আমরা তখন খুব ছোট। পিসেমশায় একবার বান্দরখাল হতে আমাদের নিলামবাজারের বাড়িতে আসেন। মাসখানেক কাটিয়ে আবার তাঁর কর্মস্থল বান্দরখালে ফিরে যাবেন। আমরা বায়না ধরি আমরাও যাব। প্রথমে বাবা আপত্তি করেন। পরে পিসিম মধ্যস্থতায় পিসেমশায়ের সাথে বান্দরখালে রওনা হই। সেবার আমাদের প্রথম রেলগাড়ি চড়া। সে যে কি আনন্দ!

বড় ভাল লাগল বান্দরখাল রেল স্টেশন। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক আর রাতের বেলায় দূরবর্তী গ্রামের ডুমডুম ঢাকের আওয়াজ। কোথাও শোনা যায় কীর্তনের সুর। মাঝে মাঝে ভেসে আসে পাহাড়ীদের গান বাজনা।

ছোট রেলওয়ে কোয়ার্টার।

সেদিন রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর পিসেমশাই আমাদের তাঁর শিকার-কাহিনী শোনাচ্ছিলেন। রাত দশটার ট্রেন তখনও আসেনি। পিসিমা নিবিষ্ট মনে গল্পের বইতে মশগুল। সুশান্তবাবু 'টরে টক্কা' করে কি যেন সংবাদ পাঠাচ্ছেন। আমরা বেশ শুনতে পাই, তিনি হেঁকে বলেন: রাম সিং, সিগন্যাল দাও, গাড়ি ছেড়েছে।

পিসেমশাই আরম্ভ করেন—এই তো সেদিন বিকেলের দিকে নিবিষ্ট মনে অফিসের কাজ করছি, কতকগুলো পাহাড়ী মানুষ আমার কাছে এসে কেঁদে বলে—একটা বাঘ পর পর দুটো দুগ্ধবতী গাভীকে বনে টেনে নিয়ে গেছে। আমাকে একটা উপায় করতেই হবে। এতগুলো মানুষের অসহায় মুখ আমার শিকারের নেশায় ইন্ধন যোগায়।

সুশান্তের উপর স্টেশনের ভার দিয়ে ৪০৫ বোরের রাইফেলটা নিয়ে ওদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। জঙ্গলে এসে যখন পৌঁছেছি, তখন সূর্য প্রায় অস্ত যায় যায়। একটা উঁচু গাছে উঠে মরা গরুটাকে দেখতে পাই।

আর বাঘটাকে দেখি নিশ্চিন্ত মনে আহারে নিমগ্ন। হঠাৎ কি মনে করে বাঘটা উঠে দাঁড়িয়ে আমি যে গাছে ছিলাম সেদিকে একবার তাকায়। বাঘের পক্ষে আমাকে দেখা সম্ভব নয়, কারণ গাছটি ছিল গভীর ঝোপঝাড়ে আকীর্ণ। কিন্তু ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে আমার অবস্থান বোঝা বাঘের পক্ষে অসম্ভব নয়। বাঘটা কয়েক পা আমার দিকে এগিয়ে আসতেই, সুযোগ বুঝে আলো ফেলে ট্রিগার টিপি। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বিকট গর্জন করে বাঘটা নিচের ঢালু-খাতে নেমে যায়। আহত বাঘের ভয়ে আমি সারারাত জেগে গাছেই কাটাই। পায়ের ছাপে বুঝতে পারি গুলি বাঘের বাঁ-পায়ের থাবাতে লেগেছে।

পরদিন সকালে বাড়ি ফিরি। পর পর কয়েকদিন আহত বাঘটিকে মারবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। মনে মনে শঙ্কিত হই, আহত বাঘটি

কালক্রমে মানুষখেকো হয়ে উঠবে।

একদিন সন্ধ্যার পর স্টেশনে বসে কাজ করছি। হঠাৎ বোট্‌কা গন্ধে জানালার দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা বাঘ অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। ছুটে গিয়ে রাইফেল নিয়ে আসি। বাঘ টের পেয়ে গা-ঢাকা দেয়। পর পর আরো কয়েকদিন বাঘটাকে দেখি। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে যেন।

বুঝলাম সেই আহত বাঘ, আমাকে মেরে প্রতিশোধ নিতে চাইছে। সাবধানে চলাফেরা করি। ভাবলাম, চোখের আড়াল হলে বাঘ হয়তো মনে করবে আমি কোথাও চলে গেছি। তাই কয়েকদিন ছুটি নিয়ে নিলামবাজার হতে ঘুরে আসব বলে ঠিক করি।

হঠাৎ পিসেমশাই বলে ওঠেন: কি ব্যাপার, সুশান্তর সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না যেন। দশটা বেজে গেল, ট্রেন বোধ হয় লেট্ রান করছে।

পিসেমশাই উঠে স্টেশনের দিকে যান।

জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আমরা দু'ভাই দেখি, পিসেমশাই স্টেশনের ঘরে ঢুকেই তিন পা পিছিয়ে আসেন। কয়েক সেকেণ্ড থমকে দাঁড়ান। তারপর ক্ষিপ্রগতিতে স্টেশন ঘরের দরজায় বাইরের শিকলটা টেনে দেন। ছুটতে ছুটতে কোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে রাইফেলটা তুলে নেন।

পিসিমা বলেন: কিগো, ব্যাপার কি?

পিসেমশাই হাঁফাতে হাঁফাতে উত্তর দেন: সর্বনাশ হয়েছে। সম্ভবত সেই আহত বাঘটি আমার উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সুশান্তকে মেরে ফেলেছে। স্টেশনে গিয়ে দেখি বাঘ সুশান্তর পিঠের উপর চেপে বসে আছে। আর রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত সুশান্তর দেহ মাটিতে পড়ে আছে।

একটু যেন দম নেন পিসেমশাই।

তারপর বলেন: বাইরে থেকে শিকল টেনে দিয়ে এসেছি। বাঘ

পালিয়ে যেতে পারবে না।

তিনি রাইফেল হাতে ছুটতে ছুটতে স্টেশন ঘরের দিকে গেলেন। ইতিমধ্যে ট্রেনও স্টেশনে প্রবেশ করে।

ট্রেনের যাত্রীরা এসে ভীড় জমায়। স্টেশনের জানালা দু'টি লোহার শিক দিয়ে আবৃত। বাঘের পালাবার পথ বন্ধ।

জানালা দিয়ে পিসেমশাই উঁকি মারতেই বাঘটি আক্রোশে হুঙ্কার দিয়ে জানালার উপর লাফিয়ে পড়ে। পিসেমশাইকে ধরতে না পেরে বাঘ রাগে আস্ফালন করতে থাকে।

কী ভয়ানক দৃশ্য! আমরা দু'ভাই জানালার ধারে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখি। ভয়ে আমরা কাঠ হয়ে যাই।

পিসেমশাই সবাইকে নীরব থাকার নির্দেশ দিয়ে ধীরস্থিরভাবে স্টেশন ঘরের ভিতর দেখতে থাকেন।

নাঃ, সুশান্ত মারা গেছে। বুকের স্পন্দন স্থির। মুখ দিয়ে নির্গত রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। জামাকাপড় তার লালে লাল। বুকের খানিকটা অংশ ক্ষত-বিক্ষত।

পিসেমশাই নিশ্চিন্ত হয়ে রাইফেলের সেফ্‌টিক্যাচ্‌ খুলেন। তারপর সুযোগ বুঝে ট্রিগার টিপেন।

বাঘটি একটি চাপা গর্জন করে এলিয়ে পড়ে। মিনিট পাঁচেক দাঁড়ান পিসেমশাই। তারপর দরজার শিকল খুলে ভিতরে ঢুকেন। সুশান্তর নাড়ীর স্পন্দন দেখেন। বাঘের পা-টি দেখে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন—'হ্যাঁ, সেই আহত বাঘটাই বটে।'

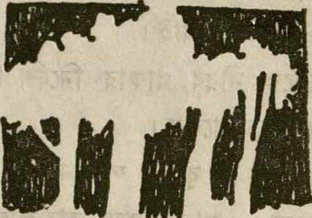
ধরাধরি করে সবাই সুশান্তবাবুকে বাইরে নিয়ে আসে। সুশান্ত-বাবুর বিধবা মা ছুটে আসেন। সে আর এক করুণ দৃশ্য!

সুশান্তবাবু ছিলেন মায়ের একমাত্র সন্তান। পিসেমশাই হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠেন। বলেন—'মাসিমা, সুশান্ত নিজে মরে আমাকে বাঁচিয়ে গেল। এ-মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী।'

আহা, পিসেমশায়ের কি কান্না!

এরপর কয়দিন পিসেমশাইকে আহার, নিদ্রা ও জলস্পর্শ করতে দেখিনি। উন্মাদের মত তিনি স্টেশনের বারান্দায় পায়চারি করে বেরিয়েছেন। তদানীন্তন আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বুদ্ধি ও সাহসিকতার জন্য পিসেমশাইকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেন। সেই টাকা তিনি সুশান্তবাবুর মাকে দিয়ে বলেন—'মাসিমা, আজ থেকে আপনার ভার আমি নিলাম। সুশান্ত আমার ছোট ভাই।'

সেই থেকে আমরা সুশান্তবাবুর মাকে পিসেমশায়ের সংসারে দেখে আসছি।



সিংহ মহারাজা
সত্যিই দস্যুরাজা



বিস্ফারিত নয়নে নবনীতা প্রশ্ন করে: সে কি বাবা! আফ্রিকা ও ভারতের গিরবন ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও সিংহ নেই?

বললাম: না। আফ্রিকার জঙ্গলে প্রচুর সিংহ আছে আর গিরবনে মাত্র কয়েক শ'।

ভারতের পশ্চিমে গির অরণ্যের সীমানা কয়েক শ' বর্গমাইল—আরব সাগরের কাছ অবধি।

সৌরাষ্ট্রের জুনাগড় শহর থেকে ট্যাক্সিতে বা মোটরে প্রায় ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করলেই গিরবনে পৌঁছানো যায়। কিছুটা পাকা রাস্তা, তারপরই এবড়ো-খেবড়ো পাথর বিছানো পথ।

আশ্বিনের শেষ—সুন্দর সবুজ ঘাস, এখনো শীতের আমেজ গায়ে লাগেনি। রাত্রিটা জুনাগড়ে কাটিয়ে পরদিন ভোরে গাড়ি এসে থামল ফরেস্ট অফিসের সামনেই। সুন্দর সাজানো বাড়ি। ঝকঝকে তকতকে। টুরিস্ট অফিস, বিশ্রামাগার, সাজানো-গোছানো লাউঞ্জ, সোফাসেট্, বাবুর্চি-আরদালি সবই আছে। সম্মানিত অনেক বিদেশী। রাজ-অতিথিরা গিরবনে আসেন সিংহ দর্শনে। তাই এই সুন্দর ব্যবস্থা। এখান হতে অনুমতি নিয়ে গাইড ও সেন্ট্রি সঙ্গে নিয়ে তবে বনের ভিতরে যেতে হয়।

সংখ্যায় ছিলাম আমরা চারজন।

আমি, শিলং-এর ঝণ্টু, ক্যামেরাম্যান মোনা চৌধুরী আর নিলাম-বাজারের যশস্বী শিকারী লাখুদা।

ঝণ্টু যেমন দীর্ঘদেহী সবল, তেমন সাহসী ও মনটা অতি সহজ সরল। আর লাখুদা? শুনেছি শিকারে লাখুদার নাকি খুব নামডাক। কাছাড়ের পুব পাহাড়ে তিনি বহু বাঘ মেরেছেন আর আফ্রিকার কেনিয়ার জঙ্গলে কয়েকটা সিংহ। কিন্তু গির ভ্রমণকালে লাখুদাকে

একবারও গাড়ি থেকে নামতে দেখিনি। বরং গাড়ির কাচ তুলে দিয়ে নির্বিবাদে বসে ঘুমিয়েছেন। বললেন: যা যা, তোরা দেখে আয়। ওসব বাঘ-সিংহ আমি বহু দেখেছি। দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে।

লাখুদা পূর্ব হতেই টাকাকড়ি জমা দিয়ে পাস ইস্যু করিয়ে সব ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছিলেন। এসব ব্যাপারে অবশ্য লাখুদা সিদ্ধ হস্ত, এতটুকুও ত্রুটি নেই।

ফরেস্ট রেস্টুরেন্ট থেকে কিছু চা ও জলখাবার খেয়ে আমরা দুটি গাড়ি করে রওনা হলাম। সঙ্গে বন্দুকসহ দু'জন সেন্ট্রি ও গাইড মিঃ বিশ্বনাথন।

পশুরাজদের জন্য যত্নের কোন ত্রুটি নেই। অঢেল ব্যবস্থা। ফরেস্ট অফিসের ভেতর রয়েছে পশু-চিকিৎসক। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও যথেষ্ট।

অসুস্থ সিংহদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিষেধক হিসাবে যেখানে ওরা জল পান করে, সেখানে জলে ওষুধ মেশানো হয়। তাছাড়া একরকম বিশেষ ধরনের বন্দুক নিয়ে ইন্জেক্সনকে গুলির মত ছোঁড়া হয়। সেই ওষুধ রক্তের সঙ্গে মিশে কাজ করে। দরকার হলে ঘুমুবার ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে চিকিৎসা করা হয়।

নিস্তব্ধ বনভূমি। গিরবনের সৌন্দর্যও কম নয়। বনে-জঙ্গলে ঘোরার একটা নেশা ও আমেজ আছে।

গাড়ি চলাকালীন লাখুদা কাচটা তুলে দিলেন, বললেন: কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। শরীরটা ভাল নেই।

আমরা মুখ টেপাটেপি করে হাসি। শরতের সকালে গিরবনে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া কোথাও খুঁজে পেলাম না।

গাড়ি দুটো পাকারাস্তা ছেড়ে নুড়ি-বিছানো পথে চলেছে। বনের মাঝে কোথাও দু'চারটি কুঁড়েঘর চোখে পড়ে। মহারাজের রাজ্যে প্রজা-বসতি অথবা মহারাজের উজির-নাজির বা প্রজাবৃন্দ হয়ত।

লাখুদা ঘুমন্ত চোখ দুটো না খুলেই বললেন : এজন্যই তো সিংহকে পশুরাজ বলা হয়। লোকে বলে, দিনের বেলায় সাধারণত সিংহ বা সিংহীর নিকট হতে আক্রমণের কোনো ভয় থাকে না।

লাখুদার পশু-পাখি সম্বন্ধে জ্ঞান অঢেল, একথা স্বীকার করতেই হবে।

গিরবনের রুক্ষ মাটি। মাঝে মাঝে উচু টিলা। জুনাগড়ের এসব অঞ্চলে বহু বুনো গাধাও চরে বেড়ায়। বুনো গাধা দেখতে ঠিক আমাদের গৃহপালিত পোষা গাধার মতনই। তবে কিঞ্চিৎ বড়, বলিষ্ঠ ও সতেজ বলে মনে হল।

গিরবনে এভাবে গাড়ি করে অথবা পায়ে হেঁটে কয়েক গজ দূর থেকে সাধারণ দর্শকেরা পশুরাজ দর্শন করেন। কিন্তু মাননীয় সম্মানিত অতিথিদের জন্য অন্য ব্যবস্থা আছে। বনের মধ্যে বড় বড় গাছ আছে তাতে মাচা বাঁধা হয় অথবা কোথাও টাওয়ার করা হয়েছে। রাত্রে সে মাচায় বা টাওয়ারে বসে স্পট্ লাইট জেলে সিংহ দেখা হয়।

আমাদের গাড়ি একটা বড় গাছের নিচে এসে থামল। স্বামীনাথন বললেন : সকালের দিকে একটা সিংহী একটি মোষকে মেরেছে, ঐ যে উঁচু মোটা গাছটি দেখা যাচ্ছে, ঠিক তারই নিচে।

দু'একটি শকুনকে আশেপাশের গাছের শাখায় নিবিষ্ট মনে বসে থাকতে দেখলাম। কয়েক গজ দূরে গাড়ি থেকে নেমে খানিকটা পথ হেঁটে গিয়ে একটি গাছের নিচে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম।

যেখানে মরা মোষটা পড়ে আছে, সেখান হতে আমাদের দূরত্ব খুব বেশি নয়। কয়েক ঘন্টা আমরা কাটিয়ে দিলাম। রাজদর্শন তখনও ভাগ্যে ঘটে নাই। হঠাৎ শুকনো ঘাসে মচ্ মচ্ শব্দে দেখি—একটি সিংহী বেশ গুরু-গম্ভীর চালে দুটি শাবকসহ মরা মোষটার নিকট এল। চারদিক একবার দৃষ্টিপাত করে আহারে নিমগ্ন হ'ল। তখন পৌনে বারোটা। মহারানীর লাঞ্চের সময় বটে।

খানিক পর আসেন স্বয়ং মহারাজ। সিংহ এসে আদরে মহারানীর ঠোঁট লেহন করেন। সিংহীর লেজটা যেন আনন্দে নড়ে ওঠে। বাঃ, অপূর্ব দৃশ্য! আজও আমার চোখে ভেসে রয়েছে।

মোনা চৌধুরী ও ঝন্টুর ক্যামেরা ক্লিক্ করে উঠল। আর লাখুদা? তিনি তখনও মোটরের কাচ তুলে নির্বিবাদে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

পরদিন সকালেও স্বামীনাথনকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি করে কয়েক রাউণ্ড দিলাম। আজও দু'বার রাজদর্শন হল। কিন্তু একবার মহারাজ আমাদের দেখে কয়েক পা এগিয়ে এসে একটি হুঙ্কার ছাড়লেন।

মনে হল বললেন: ব্যয়দপ, রাজদর্শনের সেলামী কোথায়?

আজকাল তো সেলামী ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না, ঘরভাড়াই বলুন অথবা রাজদর্শনই করুন।

তারপর কি মনে করে সিংহ-মহারাজ ডানদিকের ঘন ঘাসবনে প্রবেশ করলেন।

আকৃতি ও প্রকৃতিগত স্বভাবে সিংহ বাঘের সমগোষ্ঠী। তবুও সিংহ যে পশুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। পশুরাজ সিংহ হিংস্র হলেও বাঘের মত অত লোভী বা পেটুক নয়। ক্ষুধার্ত বা উত্তেজিত না হলে সিংহ কখনো অন্য প্রাণীকে আক্রমণ করে না। শিকারের সময় শিকার ধরতে না পারলে, দ্বিতীয়বার আর তার পশ্চাৎ অনুসরণ করে না। সিংহের অনেক গুণ, সেজন্য একে পশুরাজ বলা হয়।

সিংহ সাধারণত দু-তিনটি সিংহী নিয়ে বুক ফুলিয়ে বীরদর্পে চলাফেরা করে—দিল্লির মোগল বাদশাদের বেগম পোষার মতন। আহার বা অন্যান্য ব্যাপারে সিংহ বাঘের মত আত্মকেন্দ্রিক নয়। জন্তু-জানোয়ার মেরে বাঘের মত লুকিয়ে রাখে না। বাঘের মত টাটকা বা বাসী যে কোনো মাংস সে ভক্ষণ করে। সাধারণত সিংহের সমগ্র পরিবার সন্ধ্যার পরই শিকারের সন্ধানে বের হয়। সেজন্য বাঘ হতে সিংহ

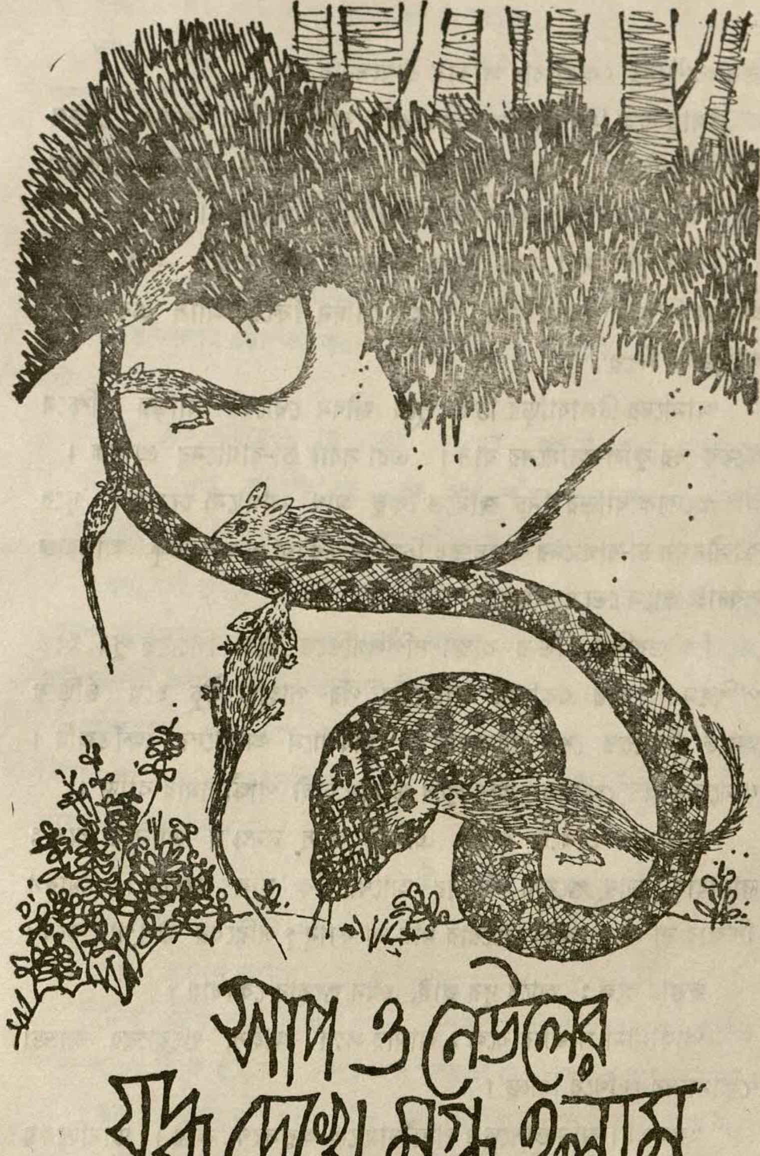
শিকার সহজ। সিংহীরাই শিকার ধরে। প্রয়োজনবোধে সিংহও সিংহীকে সাহায্য করে এবং ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনিসহ সবাই মিলে আহার করে। লোকে বলে দিনের বেলায় সাধারণতঃ সিংহ ও সিংহীর নিকট হতে আক্রমণের কোনো ভয় থাকে না। এমন কি যে অঞ্চলে কোনো বন্দুক ব্যবহৃত হয় নাই এবং মানুষেরা তাদের ত্যক্ত-বিরক্ত করে নাই, সে অঞ্চলে সাধারণত সিংহ কোনো মানুষ নিহত করেছে বলে শোনা যায় নি।

সিংহ ২৫ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে। একসঙ্গে তিনটি হতে ছয়টি পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করে। গর্ভধারণকাল ৯২ হতে ১১৩ দিন।

সিংহ যখন বৃদ্ধ হয়, তখন সে নরখাদক হয়ে উঠে। একবার নর-খাদক হলে সে বরাবরই নর-মাংস খাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। এমন কি বৃদ্ধ-সিংহকে কচ্ছপ খেতেও দেখা গিয়েছে। অর্থাৎ বার্ধক্য-হেতু ক্ষিপ্রবেগে জন্তু ধরে খাবার শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে। ফলে পশুরাজের এই অবস্থা—গদীচ্যুত রাজা যেন।

পরদিন গিরবনকে বিদায় জানিয়ে জুনাগড়ে ফিরে এলাম। কিন্তু সিংহের সেই গগনবিদারী হুঙ্কার আজও আমার মনে সজাগ হয়ে রয়েছে।





সাপ ও নেউলের যুদ্ধ দেখে মুগ্ধ হলাম

ইতর প্রাণীদের একতাবোধ সত্যিই প্রশংসনীয়।

কথায় বলে 'সব শিয়ালের এক রা'। বানর, হরিণ, শিয়াল, নেউল প্রভৃতি প্রাণীদের একতাবোধ রয়েছে। এমন কি খুদে পিঁপড়েরা একতাবদ্ধ। নেই শুধু আমাদের মত সুশিক্ষিত মানুষের।

দাদার শট্গানটা নিয়ে মোরগ শিকারে বেরিয়েছি। সঙ্গে আছে অভিজ্ঞ শিকারী ছত্তার মিয়া। কিন্তু সেদিন ফিরে আসি এক নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে।

আমাদের টিলাবাড়ির ঠিক পুবে জীবন ঘোষের বাড়ির পশ্চিমে কয়েক ঘর কুলি-কামিনের বাস। এরা সবাই চা-বাগানের শ্রমিক।

প্রত্যেক বাড়ির নিচু জমিতে কিছু আখ লাগানো হয়েছে। দূরে কালীনগর চা-বাগানের কলঘরের চিমনির ধোঁয়া ও ভক্ ভক্ আওয়াজ সর্বদাই কানে ভেসে আসে।

পি. ডবলিউ. ডি-র রাস্তা সর্পিলগতিতে চলে গিয়েছে পুব হতে পশ্চিমে। আর একদিকে পাহাড়ের পর পাহাড় উঁচু হয়ে ছড়িয়ে আছে দিগন্তের শেষ সীমানায়। মাঝখানে আমাদের ক্ষেতিজমি। ধানক্ষেত। ক্ষেতের দক্ষিণ-পুবে স্থানীয় চাষী পাঙ্কীমামার বাড়ি।

আমাদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে নমস্কার জানিয়ে বলে: দাদাবাবু, ছাখ্ শুয়োর আমার আখের কি হাল করেছে। মোরগ শিকার না করে দুটো শুয়োর মার না ক্যান্? গরিবের উপগার হবে।

ছত্তার বলে: আরে দূর ছাই, এখন শুয়োর কোথায়?

পাঙ্কীমামা সজোরে বলে: আমার লগে আইস, শুয়োরের আড্ডা তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি।

অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাঙ্কীমামাকে অনুসরণ করি। ডানদিকের ঝোপজঙ্গল ও নলখাগড়ার বনটি পেরিয়ে আমরা একটা নালার ধারে এলাম।

পাক্ষীমামা বলে : ঐ নালার ওপারে নলখাগড়ার ওই যে হোথায় সরু পথটি দেখছ, ওটি হচ্ছে শুয়োরের বাসস্থান।

নালার আশেপাশে শুয়োরের পায়ের টাটকা দাগ অবশ্য অনেকগুলো দেখতে পাই। কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও একটি শুয়োরও দেখতে পাইনি।

আমি ও ছত্তার ঝোপঝাড়ওয়ালা একটি ছোট গাছে উঠে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি।

গাছের ডালে বসে থাকতে থাকতে আমরা বিরক্ত হয়ে উঠি এমন সময় নালার ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসে দুটো হৃষ্টপুষ্ট নেউল।

নেউল দুটি ছুটছে, আর একটি বিষধর কেউটে সাপ প্রাণভয়ে আশ্রয়ের আশায় ধানক্ষেতের মাঝে গর্ত খুঁজে বেড়াচ্ছে। সাপটি মাঝে মাঝে ফণা বিস্তার করে শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখছে।

একটি গর্ত পেয়ে সাপটি যেই দেহের তিন-চতুরাংশ গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছে, বিদ্যুৎবেগে ছুটে আসে একটি নেউল। লেজের শেষ অংশটি কামড়ে ধরে। তারপর দ্বিতীয় নেউলও তাকে সাহায্য করে।

অনেকক্ষণ ধরে চলে সাপে নেউলে টাগ্-অব্-ওয়ার। গর্তের ভিতরে সাপের দেহের বেশি অংশ থাকায় নেউল দুটি বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পাচ্ছিল না।

খানিকক্ষণ যুদ্ধ হয়। দেখি একটি নেউল সাপের লেজটি কামড়ে ধরে বসে আছে। আর একটি নেউল 'কিচ্‌মিচ্' শব্দ করে নালার পথে ঝোপে প্রবেশ করে।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে দেখি একদল নেউল, সংখ্যায় পাঁচটি ধানক্ষেতের দিকে ছুটছে। মনে হল সৈন্যরা যেন যুদ্ধ করতে চলেছে।

ইতর প্রাণীদের একতা ও বুদ্ধি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ছয়টি নেউল একত্রিত হয়।

কথায় বলে 'দশের লাঠি একের বোঝা'। প্রথমে যে নেউলটি

সাপের লেজ ধরে রেখেছিল, সে তখন আপ্রাণ চেষ্টায় টানতে থাকে। সাপের দেহের কিছু অংশ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি নেউল কামড়ে ধরে। উভয়েই জোরে টানতে থাকে। খেলার মাঠে দড়ি টানাটানির দৃশ্য যেন। তারপর তৃতীয় নেউল যোগদান করে।

ত্রিশক্তির আকর্ষণে সাপের দেহ আর একটু বের হয়। চতুর্থ এবার যোগ দেয়। তারপর ছয়টি নেউলের সমবেত আকর্ষণে সাপের দেহ উপরে উঠে আসে।

সাপের ক্ষুব্ধ ফোঁস-ফোঁসানির মাঝে একটি নেউল সাপটিকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। সাপটি অবশ্য নেউলগুলোকে ছোবল মারার চেষ্টা করে। কিন্তু নেউলদের ক্ষিপ্রগতি ও কৌশলের কাছে হার মানতে হয়।

গোখরা-কেউটে ফণা তুলে দ্রুত ছোবল মারতে পারে, কিন্তু নেউলের ক্ষিপ্রতা তার চেয়ে দ্রুত। আসলে নেউলের হাতিয়ার হল—তার ধারাল দাঁত, তীক্ষ্ণ নখ আর ক্ষিপ্রগতি। এতেই সে সাপকে কাবু করে। সাপও যদি একবার নেউলের উপর ছোবল মারতে পারে, তবে নেউলের মৃত্যু অনিবার্য।

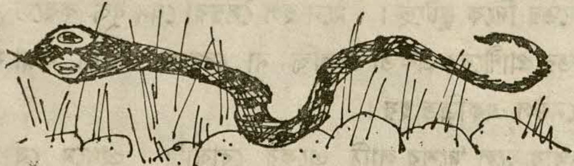
অনেকে বলেন, সাপের লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে নেউল গাছবিশেষের শিকড় খেয়ে আসে। একেবারে মিথ্যা কথা।

যুদ্ধ শেষ। ক্লান্ত সৈনিকরা যেমন একে একে শিবিরে ফিরে যায়, ঠিক তেমনি ছয়টি নেউল নালার পথে ঝোপে ফিরে আসে।

সাপটি লম্বায় প্রায় পাঁচ হাত ছিল।

সাবাশ!

ভাবছি—ইতর প্রাণীদের একতাবোধ আর আমাদের সভ্য প্রাণীদের একতাবোধের তফাৎ কতটুকু!



সাপ



সাপ সম্বন্ধে কতকগুলো তথ্য আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। সর্প গবেষণায় বিশারদ ও বিশিষ্ট গবেষক অবনীভূষণ ঘোষ বলেন : পৃথিবীতে নির্বিষ সাপের সংখ্যাই বেশি। লোকের ধারণা সাপকে আঘাত করলে রাত্রিতে এসে সে প্রতিশোধ নেয়। এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। যে আঘাত করেন, তাকে চিনে রাখার ক্ষমতা সাপের নেই।

আমাদের চোখে যেমন পাতা আছে, সাপের চোখে তেমন পাতা নেই। তবে সাপের চোখ স্বচ্ছ আঁশ দিয়ে ঢাকা।

রাতে সাপের নাম করলেই সাপ এসে উপস্থিত হয়। এ ধারণার কোনো সত্য নেই। চন্দ্রবোরা ও কালাজ উগ্রবিষ সাপ। এদের কোনো ফণা নেই।

আমাদের যেমন কান আছে, সাপের সেরকম কান নেই। সাধারণ-ভাবে সাপ কালা। বাতাসে ভেসে-আসা কোনো শব্দ শুনতে পায় না। মানুষ যখন লাঠি ঠুকে ঠুকে হাঁটে, তখন মাটির কম্পন পেট দিয়ে অনুভব করে সাপ সজাগ হয়ে উঠে। এটাই সাপের শুনার কাজ করে।

সাপ মাত্রেই ডিম পাড়ে। এ ধারণা ভুল। সাধারণত সাপ ডিম পাড়ে ; কোনো কোনো সাপ কিন্তু বাচ্চা দেয়। যেমন চন্দ্রবোড়া আর লাউডগা সাপ।

পৃথিবীতে যত বিষধর সাপ আছে, শঙ্খচূড় তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। বিষও খুব উগ্র। সাধারণ দৈর্ঘ্য ৩ মিটার ৫০ সেন্টিমিটার। ৫ মিটার ৬০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের শঙ্খচূড়ও দেখা যায়।

উগ্রবিষ শাঁখামুটি সাধারণত সাপ খায়। লোকের ধারণা, এদের হাড় কোমরে বাঁধলে নাকি বাত ভাল হয়।

যে সাপের প্রিয় খাদ্য ছাগল, তার নাম কি জান ?

অজগর। অজ অর্থাৎ ছাগল যে খায়, তা থেকে অজগর নাম। অপর নাম ময়াল। গাছের গুড়ি বা মোটা ডালের রঙের সঙ্গে অজগরের রঙ অনেকাংশে মিল রয়েছে। ধেড়ে ইঁদুর, খরগোস, শুয়োর, হরিণ, বাঁদর—অজগরের খাদ্য। বিষহীন সাপ।

অনেক সাপের ছুটো মুখ আছে, এ ধারণাও ভুল। কোনো কোনো সাপের লেজের ডগা মোটা। কোন্‌টা মুখ আর কোন্‌টা লেজ হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না। সেজন্য আমাদের ধারণা হয়েছে—সাপের ছুটো মুখ আছে। যেমন, শাঁখামুটি।

গোসাপ, তক্ষক, আঞ্জনিকে সাধারণ লোক সাপ বলে মনে করে। আসলে কিন্তু এরা সাপ নয়—গিরগিটি জাতীয় প্রাণী। এদের কারোরই মুখে বিষ নেই।

জনশ্রুতি আছে যে, ঢেমনা ছুধ খেতে ভালবাসে। এমন কি গরুর বাঁট থেকেও সে ছুধ চুরি করে খায়। এ ধারণা ভুল। ছুধের প্রতি সাপের বিশেষ কোন আকর্ষণ নেই। ছুধ সাপের খাদ্যও নয়। তৃষ্ণায় জল না পেলে সাপ ছুধ খেয়ে তৃষ্ণা মেটাতে পারে। ছুধ দিলে খেতে পারে। এই পর্যন্ত।

গরুর বাঁট থেকে টেনে নিতে ফুসফুসের যে জোর দরকার, ঢেমনার তথা সাধারণ কোনো সাপের ফুসফুসে সে জোর নেই। দাঁত ও জিব ছুঁচাল। কাজেই বাঁটে মুখ দিয়ে তার পক্ষে ছুধ টানা কখনই সম্ভব নয়।

আমি বহু ব্যক্তিকে বাঁট থেকে সাপের ছুধ খাওয়া সম্পর্কে জেরা করেছি। বেশিরভাগ ব্যক্তিই বলেছেন—'আমি নিজে দেখিনি, তবে অমুক বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনেছি।' অল্প কয়েকজন মাত্র বলেছেন—'আমার নিজের চোখে এ ঘটনা দেখেছি।' কিন্তু জেরার চাপে তাঁদেরও মুখ থেকে বেরিয়েছে—'গোয়ালঘরটা অন্ধকার ছিল—আমরা দূর থেকে দেখেছি।'

আমরা সচরাচর বলে থাকি বিষধর সাপের মুখের দু'পাশে একটি করে দুটি বিষদাঁত থাকে। একথা পুরোপুরি ঠিক নয়। একটি করে দুটি সক্রিয় বিষদাঁত থাকে, বড়জোর একথা বলা চলে। সক্রিয় বিষদাঁতের গোড়ায় বা ঠিক পিছনে আর কয়েকটি ছোট ছোট বিষদাঁত থাকে। এদের বলে অঙ্কুর বিষদাঁত। কোনো সক্রিয় বিষদাঁত ভেঙে গেলে অথবা আপনা থেকে পড়ে গেলে এইসব অঙ্কুর বিষদাঁত একে একে বড় হয়ে তার স্থান নেয়। অঙ্কুর বিষদাঁত ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে সক্রিয় বিষদাঁতে পরিণত হয় দু-তিন সপ্তাহ থেকে ছ'সপ্তাহের মধ্যে।

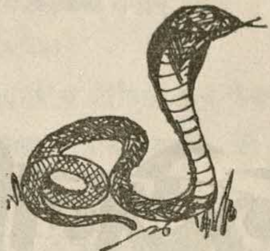
গল্পে আছে আফিমখোরকে বিষাক্ত সাপে কামড়ালে, উল্টে সাপটাই মরে যায় অথবা আফিমখোরের কিছুই হয় না। এটা নিছক আজগুবি কথা। আফিমে সর্প-বিষ নষ্ট হয় না। কাজেই আফিমখোরকে বিষাক্ত সাপ কামড়ালে তার মৃত্যু অনিবার্য।

জলঢোঁড়ার কোন বিষ নেই। জনশ্রুতি আছে যে, দংশনের পর সর্পাহত ব্যক্তি যদি গোবর মাড়ায় তাহলে ঐ ক্ষতস্থানে বিষ সৃষ্টি হয়। এই জনশ্রুতি যে মিথ্যা, তা বলাই বাহুল্য। এই জনশ্রুতির কারণ হল—মনসাদেবীর নির্দেশে জলঢোঁড়া বিষ মুখে নিয়ে চলেছিল লখীন্দরকে দংশন করতে। জলঢোঁড়া বড় চঞ্চল, লোভী ও ছটফটে। পথে জলাশয়ে মাছ কিলবিল করতে দেখে সে মুখের বিষ গোবরে রেখে মাছ খেতে ছোটে।

সাপে কামড়ালেই যে বিষধর সাপ দংশন করেছে— এটা ভাববার কোনো কারণ নেই। বিষহীন সাপও দংশন করে। কম বিষওয়ালা সাপেও দংশন করতে পারে। দংশক সাপটিকে মারা উচিত নয় বলে যে ধারণা আছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। দংশক সাপ সর্পাহত ব্যক্তির দেহ থেকে বিষ চুষে নিতে পারে না।

মোটা বকশিসের লোভে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অনেক অভিজ্ঞ

সাপুড়ে সম্প্রদায় বন্য বিষধর সাপ নিয়ে খেলা দেখায়। এর মধ্যে অলৌকিকতা কিছু থাকে না। থাকে কেবল সাপের ধরন-ধারণের অভিজ্ঞতা। এই ভেল্কি দেখিয়ে সাপুড়েরা শিকড়-বাকড় দেয়, যাতে সাপে কাটলে মৃত্যু হবে না। শিকড়-বাকড় সম্পূর্ণ মিথ্যা।



টিউলেনি দ্বীপের সীলমাছ

শিখা, বনা, খুকু, লোহিতা, ডিউক, রাণু ও ঝন্টু ওরা সকলেই গল্প শোনার জন্য আমাকে সপ্তরথীর মত ঘেরাও করে ফেললো।

ওদের শান্ত করে বললাম: তোরা চুপ করে বস। আমি আজ বরফের দেশের প্রাণীদের কাহিনী বলছি।

বরফের দেশ সাইবেরিয়া।

এশিয়ার মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখ, উত্তরে মাইলের পর মাইল, কয়েক শ' মাইল শুধু বরফ আর বরফ। উঃ। কি শীত, হাত-পা অসাড় হয়ে আসে।

প্রকৃতিদেবী এখানে রেফ্রিজেটার বসিয়ে বরফ তৈরি করছেন। তোদের স্কুলটা যদি সেখানে হত, তবে কি মজাই না ছিল! শুধু চিনি মিশিয়ে দিলেই কুলপি ও মালাই বরফ তৈরি হয়ে যেত।

শীতের দেশ বলে লোকের বসতিও কম। জন্তু-জানোয়ারও খুব অল্প। শ্বেত ভল্লুক ও উস্‌রি নদীর বনভূমিতে কিছু বাঘ দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে কিন্তু প্রচুর হাঁস ও গিলমেট পাখি দৃষ্টিগোচর হয়।

লোহিতা বললে: আমরা না হয় শীতের হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য গরম পোশাক তৈরি করিয়ে নিলাম। কিন্তু সাইবেরীয় প্রাণীদের বাঁচার উপায় কি?

বললাম: ধৈর্য হারিয়ো না, শোন। ভগবান সেজন্য তাদের সারা-দেহে ঘন লোম দ্বারা আবৃত করে দিয়েছেন। ইয়া বড় বড় ঘন ঘন লোম। শ্বেত ভালুকের পিঠে হাত বুলালে বুঝতে পারবে যে, ভগবান যেন এক টুকরো ডানলোপিলো দিয়ে ঢেকে রেখেছেন।

সমুদ্রের ধারে গেলে দেখা যাবে অগণিত সীলমাছ। ওদের দেহ অতি নমনীয়। চামড়ার নিচে এত চর্বি থাকে যে, ঐ চর্বিই ওদের শীতের হাত হতে রক্ষা করে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার আরম্ভ করলাম।

সেবার যখন জাপানে গেলাম, ইকোমা নামে এক জাপানী বন্ধুর সহায়তায় টোকিও হতে হোক্কাইডো দ্বীপে পৌঁছলাম। হোক্কাইডোর উত্তরে সাখালিন দ্বীপ। এই দ্বীপটি রাশিয়ার অন্তর্গত। সাখালিন দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কিছু দূরে তিউলেনি দ্বীপটিকে দূর হতে দেখে মনে হবে যেন একটি কালো রঙের হাতি সমুদ্রের অর্ধশায়িত অবস্থায় অবগাহন করছে।

বন্ধু ইকোমা বললে : ব্রাদার, সামনে কি দেখছ?

খালি চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি একটি কালো বস্তু সমুদ্রের মধ্যে ভেসে রয়েছে।

মনে মনে ভাবলাম, আফ্রিকায় প্রচুর জলহস্তী দেখা যায়। কিন্তু এই অঞ্চলেও কি জলহস্তী আছে?

দুরবীনটি এগিয়ে দিল ইকোমা। চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখি, ওরে বাপ্‌স্—কয়েক হাজার সীলমাছ কুস্তি লড়ছে। ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি, চীৎকার ও গর্জনে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে এক ঝাঁক পাখি কিচির-মিচির আওয়াজ তুলে দ্বীপটিকে সরগরম করে তুলেছে। এত পাখি আর অসংখ্য সীলমাছ দ্বীপটির চারদিক ছড়িয়ে রয়েছে যে, ধূসর মৃত্তিকা আর চোখে পড়ে না। একটু দূরে কতকগুলো সীলমাছ সমুদ্রের ধারে দেহ এলিয়ে রৌদ্র-সুখ উপভোগ করছে।

অতি নমনীয় দেহ—জলহস্তীর মত তুলতুলে, সরষের তেল মেখে রোদ পোহাচ্ছে যেন। সূর্যের কিরণ পড়ে সীলমাছের দেহগুলো চিক্‌-চিক্‌ করে উঠছে।

বাঃ, অপূর্ব শোভা!

ইকোমা বললে : গ্রীষ্মের প্রাক্কালে প্রথমে আসে পুরুষ সীলেরা। তারা এসে ঘরদোর ঠিক করে সাজিয়ে রাখে। তারপর একমাস পর

পানের বাটা হাতে করে, জর্দা দিয়ে পানটি চিবোতে চিবোতে আসেন যেন সীল গৃহিনীরা।

এক-একটা সীলের ত্রিশ হতে পঞ্চাশটি পর্যন্ত পত্নী থাকে—মোগল বাদশাহের হারেম পোষা।

স্ত্রী-সীলদের সেবা যত্ন করে এই পুরুষ-সীলেরা। বাচ্চাগুলো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় জড়ো হয়ে খেলা করে। মাঝে মাঝে মা গিয়ে তদারকি করে। নিজের সন্তানদের খুঁজে বের করে, স্তন্যপান করিয়ে গৃহিনীরা আবার ঘরে ফিরে আসে।

খুকু বললে : সীলমাছ আমাদের কি উপকারে আসে?

বললাম : সীলের চামড়া খুব মূল্যবান। দেশ-বিদেশে রপ্তানি হয়।

সীলমাছের বাচ্চারা খুব ছুটোছুটি করতে ভালবাসে। তারা দিনরাতই মারামারি, হুড়োহুড়ি ও খেলাধুলা করে বেড়ায়। বরফ-পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে তর্‌তর্‌ করে উপরে উঠে যায়। তারপর গড়িয়ে আবার নিচে নেমে আসে। ভারী মজাদার খেলা।

কিন্তু মজার ব্যাপারটা হল, জন্মগ্রহণের পর প্রায় ছ'মাস পর্যন্ত বাচ্চা সীলমাছগুলো জলকে অত্যন্ত ভয় করে। গায়ে একটু জল ছিটিয়ে দিলেই—ওরা ভয়ে আতঙ্কে পাহাড়ের খাড়াই-এর দিকে ছুটে পালাতে থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে ওদের বয়েস ছ'মাস পূর্ণ হবে, অমনি বাচ্চা সীলমাছগুলো সমুদ্রে গিয়ে আশ্রয় নেবে—যেন হেদুয়ায় সুইমিং ক্লাবের লাইফ মেম্বার।

শিখা বললে : আচ্ছা, ওরা বারো মাসই কি সাখালিনের তিউলেনি দ্বীপে বাস করে?

বললাম : না। হেমন্তকাল এলে ওরা দ্বীপ ছেড়ে গভীর সমুদ্রে চলে যায়। আবার গ্রীষ্মকাল এলেই ফিরে আসে। অর্থাৎ মনে হয় তিউলেনি দ্বীপ যেন ওদের গ্রীষ্মাবাস। অসীম সমুদ্রের মধ্যে নিজেদের

অবস্থানের জায়গাটি নির্ণয় করার ব্যাপারে সীলদের ক্ষমতা এক বিস্ময়কর। কি ধরনের প্রাকৃতিক কম্পাস বা দিক্‌নির্ণয়-যন্ত্র তাদের দেহে আছে যার সাহায্যে তারা এতোদিন পরেও অকূল সমুদ্রের বুকে তিউলেনি দ্বীপের এক ফালি ছোট ডাঙাকে চিনে নেয়।

ডিউক বললে: ওরা কি খেয়ে জীবনধারণ করে?

বললাম: সাধারণত ওরা সামুদ্রিক মাছ, শামুক ইত্যাদি খায়। তবে সমুদ্রের খাড়ির আনাচে-কানাচে যেখানে অল্প জল জমা হয়ে থাকে, সেখানে ছোট ছোট শ্যাওলা ও একজাতীয় ঘাস জন্মে। সেগুলো ওদের প্রিয় খাদ্য।

মানুষ দেখলে এরা তেড়ে আসে না অথবা হিংসার ভাব পোষণ করে না। তবে দুই সীলমাছ যখন পরস্পরে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, তখন এক ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করা যায়। একজন পরাজিত না-হওয়া পর্যন্ত কেউ ক্ষান্ত হয় না। কালো দেহের উপর টাটকা রক্তের ধারা দেখলে গা শিহরিয়া উঠে। যুদ্ধ চলতেই থাকে। বিনা যুদ্ধে কেউ সুচাগ্র মেদিনী ছাড়তে রাজি নয়।

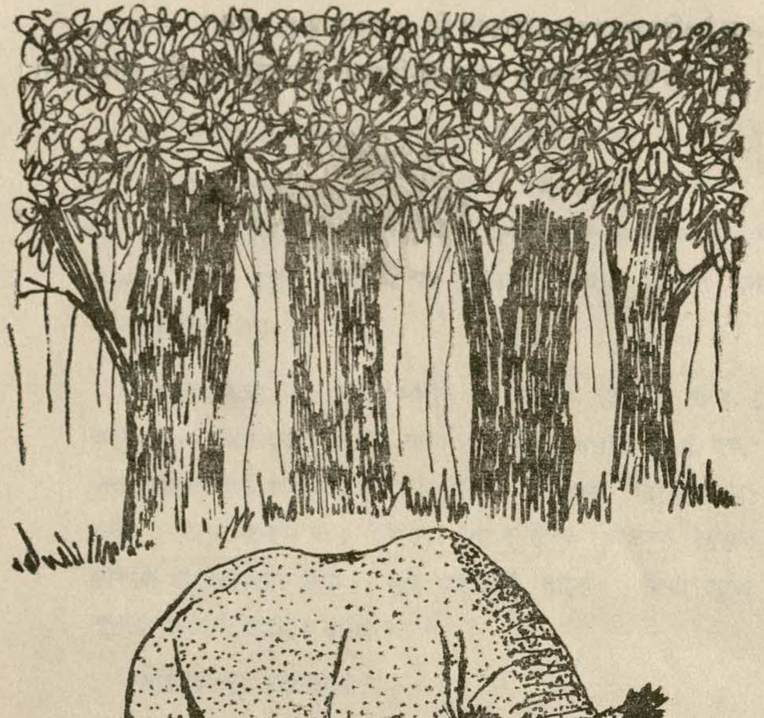
সীলেরা খুব স্নেহ-প্রবণ।

একবার একদল সাইবেরিয়ান ধীবর ওখটস্ক সাগরে মাছ ধরতে গিয়েছিল। মাছের সঙ্গে একটি সীলের বাচ্চাও ধরা পড়ে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে জেলেরা জাল গুটিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল। নৌকো ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একদল সীলমাছ নৌকোর পেছনে পেছনে আসতে লাগল। জল ছিটিয়ে চীৎকার করে সীলমাছগুলো বিক্ষোভ জানাতে লাগল, 'অন্যায়ভাবে আমাদের বাচ্চাকে ধরে নিয়ে যাওয়া চলবে না, চলবে না।'—যেন তাদের গণ অধিকার ক্ষুণ্ণ হতে দেবে না। বিস্ময়ে জেলেরা তাকিয়ে এ-দৃশ্য দেখল। তাদের চীৎকার আর কাকুতি-মিনতির ফলে জেলেরা বাচ্চাটিকে ছেড়ে দিল। সীলেদের সে-যে কি আনন্দ, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ওরা

বাচ্চাটিসহ গভীর সমুদ্রে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভোরে ইকোমার স্ত্রীর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল—প্রাতঃকালীন চা তৈরি।...এতক্ষণ তাহলে কি দেখছিলাম? স্বপ্ন?

গতকাল ইকোমার সাথে যে-সিনেমা দেখেছিলাম, এটা তারই ফল।


গণ্ডার

আসামের শিবসাগর জেলার নামতিডলে শিকারীদের সাথে ঘুরে ঘুরে অবশেষে আমি কাজিরাঙ্গায় ফিরে এলাম। কাজিরাঙ্গায় বহুবার এসেছি। কিন্তু এবারের কাজিরাঙ্গা আমার নিকট নতুন বলে মনে হল। দর্শকদের দেখাবার জন্য হাতির সংখ্যা বেড়েছে। টুরিস্ট লজ হয়েছে—দুই শয্যা-বিশিষ্ট, চব্বিশটি কক্ষ।

একদিকে মিকির পাহাড় আর অন্য দিকে ব্রহ্মপুত্র নদ— প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে কাজিরাঙ্গা অতি মনোরম। কাজিরাঙ্গার প্রধান আকর্ষণ গণ্ডার।

পৃথিবীতে ভারত ও আফ্রিকা ছাড়া আর কোথাও গণ্ডার নাই।

আবার ভারতে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ছাড়া আর কোথাও গণ্ডার দেখা যায় না। নেপালে কিছু গণ্ডার আছে। বেপরোয়া শিকারের ফলে এদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে।

ভারতীয় গণ্ডারের একটি খড়গ আর আফ্রিকার গণ্ডারের দুটি। ভারতের স্ত্রী-গণ্ডারেরও খড়্গ আছে। সাধারণত ভারতের গণ্ডারের খড়্গ সাত-আট ইঞ্চি লম্বা হয়।

গণ্ডার খড়্গ দিয়ে আক্রমণ করে না, খড়্গের চেয়ে ওদের দাঁত অনেক বেশি মারাত্মক। খড়্গ খুব নরম। একটু জোরে আঘাতেই ভেঙে যায়। আস্তে আস্তে এক বছরের মধ্যে নতুন খড়্গ গজাতে থাকে।

ভারতের গণ্ডারের অস্তিত্ব নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানা সমালোচনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারতের সভ্যতায় গণ্ডারের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। মহেঞ্জোদারোর সীলমোহরে গণ্ডারের অবয়ব খোদিত আছে। কতকগুলো সীল-মোহর নয়া-দিল্লির ভারতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে কাশ্মীর উপত্যকায় ও পেশোয়ারে প্রচুর গণ্ডার দেখা যেত। সম্রাট বাবরের শিকার কাহিনীতে গণ্ডার শিকারের উল্লেখ

আছে। গুজরাটে কাম্বের রাজা একবার একটি গণ্ডার ধরে পর্তুগালের রাজাকে উপহার দেন।

গণ্ডার কিন্তু অতি নিরীহ, তৃণভোজী প্রাণী। দেহটি বিরাট বটে, তবে স্বভাবটি ভয়ানক শান্ত। সারা অঙ্গ পুরু বর্মে ঢাকা। উত্তেজিত অথবা নিজে আক্রান্ত না হলে কাউকে কিছু বলে না। ত্রিশ গজ দূর হতে হাতির পিঠে চড়ে যে কোনো লোক অনায়াসে গণ্ডার দেখতে পারেন।

গণ্ডারের আয়ু প্রায় ৭০ হতে ৮০ বছর। গর্ভধারণকাল সাড়ে ষোল মাস। এক প্রকার শ্বেতকায় বক গণ্ডারের নিত্য সাথী। প্রধান-মন্ত্রীর বডিগার্ড যেন! বকগুলো গণ্ডারের আশেপাশে নিয়ত ঘুরে বেড়ায়। গায়ের উপর বসে খুঁটে খুঁটে পোকা আঠাল ইত্যাদি খায়। ঐ বক দেখলেই বোঝা যায় আশেপাশে গণ্ডার রয়েছে—অন্তত কাজিরাঙ্গা ও জলদাপাড়ার বনে।

গণ্ডার জল-কাদা মেশানো কর্দমাক্ত জলে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করতে ভালবাসে, ঠিক মোষদের মত। আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় তৃণাচ্ছাদিত জঙ্গলের স্যাঁতসেঁতে ভূমি গণ্ডারের পক্ষে উপযুক্ত স্থান।

আসামে বন্যার সময় গণ্ডারকে সাঁতার কেটে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে দেখা গিয়েছে। সাঁতারের সময় গণ্ডারের নাক, চোখ ও খড়্গ শুধু জলের উপর, ভেসে থাকে। পশু বিশেষজ্ঞ মিঃ ই পি জী সন্তরণত গণ্ডারের অনেক চমৎকার ছবি তুলেছেন। তাঁর সাথে আমার পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ। আমি আসামে মিঃ ই পি জী-র সাথে বহুবার বনে বনে ঘুরেছি।

ফেব্রুয়ারি মাসে কাজিরাঙ্গা ফরেস্টে ঝাঁকে ঝাঁকে গণ্ডার দেখা যায়। তখন মাটি শুকিয়ে যায় আর ঘাস ও বনগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

গণ্ডারের কোন ব্যাধি হলে মাথা পাথরের উপর ঠুকতে থাকে। সে-শব্দ আশেপাশের ঝোপ-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে প্রতিধ্বনিত হয়—মনে হয় যেন কামারেরা লোহা পিটিয়ে দা-খন্তা-হাতা ইত্যাদি তৈরি করছে। প্রসবের সময়ও এরূপ ঘটনা বহু দেখা গিয়েছে।

গণ্ডারীর যখন বাচ্চা হয়, তখন গণ্ডারী একটু উগ্র প্রকৃতি ধারণ করে—সম্ভবত সন্তান বাৎসল্যে। সে-সময় গণ্ডারী থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়।

গণ্ডার একগুঁয়ে ও দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ। কোনো কারণে গণ্ডার আপনাকে আক্রমণ করলে আপনি সর্পিলগতিতে ছুটে মাটিতে শুয়ে পড়ুন। একগুঁয়ে গণ্ডার আপনার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তার ভ্রূক্ষেপ নেই যে পাশে কোনো বস্তু পড়ে আছে।

গ্রাম্য বা পাহাড়ী অঞ্চলের লোকেরা গণ্ডারের খড়্গ ওষুধরূপে ব্যবহার করে। চীন, ব্রহ্ম ও আসামের কোনো কোনো অঞ্চলের গর্ভবতী নারীদের বিছানার নিচে গণ্ডারের খড়্গ রাখা হয়—তাতে নাকি বিনা ক্লেশে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়।

শোনা যায়—পূর্বকালে রাজা মহারাজারা গণ্ডারের খড়্গ পানীয় পাত্ররূপে ব্যবহার করতেন। কারণ, শত্রুপক্ষ কেহ লুকিয়ে বিষ পান করতে দিলে, গণ্ডারের পাত্রে তা প্রতিফলিত হয়।

গণ্ডারের 'প্রস্রাব' হাঁপানী রোগীদের নিকট উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়। অন্ধ বিশ্বাসে বহু রোগীকে আমি প্রস্রাব পান করতে দেখেছি। কিন্তু কেহ সুস্থ হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

গণ্ডার ধরা অতি সহজ। গণ্ডারের একটি অভ্যাস, সাধারণত সে একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রত্যহ মল মূত্র ত্যাগ করে এবং এক পথে সচরাচর যাতায়াত করে। এই সুযোগে শিকারীরা গণ্ডারের চলার পথে গর্ত খুঁড়ে লতাপাতার সাহায্যে কেমোফ্লাইজ করে ঢেকে রাখে। গর্তের মধ্যে ইস্পাতের নিখুঁত খাঁচা বসানো হয়। নির্বিবাদে গণ্ডার পথ চলতে চলতে গর্তের মধ্যে পড়ে খাঁচায় আবদ্ধ হয়। গর্তটি লম্বায় ১০ ফুট, চওড়ায় ৫ ফুট ও গভীরতায় ৬ ফুট করা হয়।

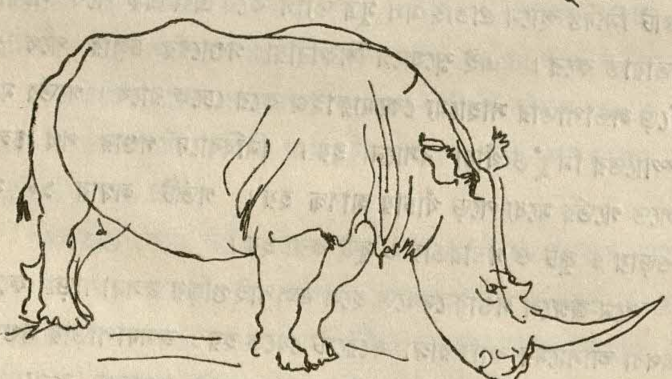
বনে-জঙ্গলে গণ্ডার দেখতে হলে জলপাইগুড়ির জলদাপাড়া ফরেস্ট অথবা আসামের কাজিরাঙ্গা ফরেস্টে যেতে হয়। জলদাপাড়ায় গণ্ডারের সংখ্যা খুব কম। পূর্বে কাজিরাঙ্গা ফরেস্টে গণ্ডারের সংখ্যা ছিল ১৫০টি হতে ৩০০টির মধ্যে। আর জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চলে গণ্ডারের

সংখ্যা প্রায় ৬৪টি। এখন এই সংখ্যা অনেক বেড়েছে। সরকারী হিসেব মত কাজিরাঙ্গায় ১৯৬৬ সনে গণ্ডারের সংখ্যা ৪০০, ১৯৭২ সনে ৫৭০ এবং ১৯৭৮ সনে সেটা বেড়ে ৯৬০এর সংখ্যায় এসে দাঁড়িয়েছে।

কলকাতা হতে কাজিরাঙ্গার দূরত্ব খুব বেশি না হলেও পৌঁছানোর ঝুঁকিও কম নয়। কলকাতা হতে বিমানে জোড়হাট, সেখান থেকে মোটরে কাজিরাঙ্গা। আর একটি পথ আছে—ট্রেনে গৌহাটি, প্রায় বাইশ ঘণ্টার জার্নি। সেখান হতে ট্যুরিস্ট বাসে বা প্রাইভেট কারে বা ট্যাক্সিতে কাজিরাঙ্গা।

বৃদ্ধ হলে গণ্ডার অনেক সময় লোকালয়ে নেমে আসে। কয়েক বছর পূর্বে, সম্ভবত ১৯৬৪ সনে জলপাইগুড়ির কাদম্বিনী চা-বাগানে একটি গণ্ডার আশ্রয় নেয়। বাগানের চৌকিদার তাকে প্রত্যহ আহার দিত—ঠিক যেন পোষা গরু-মোষের মত। সরকার হাতি নিয়ে গণ্ডারটিকে তাড়িয়ে দেন ; কিন্তু কিছুদিন পরে আবার বাগানে ফিরে আসে। বোধহয় বার্ধক্যহেতু অন্যান্য গণ্ডারের সাথে শক্তি-সামর্থ্যে কুলিয়ে উঠতে পারে না।

১৯৪১-৪২ সনে আসামের শিবসাগর জেলার একটি গ্রামে এরকম একটি ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি—প্রায় অর্ধ শতাব্দীর পূর্বের ঘটনা।




দক্ষিণবঙ্গের
নরখাদক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জিম করবেটের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ আমার ঘটেছিল। কারণ, সে-সময় আমি লাহোরে সেনাবিভাগে কর্মে নিযুক্ত।

একদিন করবেট বলেন: সুন্দরবনের বাঘের অভিজ্ঞতা আছে? না থাকলে একবার ঘুরে এসো।

প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বের ঘটনা।

অফিসের কাজে সেবার আমি ও মেজর বোল্ট্ খুলনায় একটি গ্রামে এসেছি।

জরিপের কাজে তখন সুন্দরবন অঞ্চলে তাঁবু পড়েছে। মিঃ বসু ও শর্মার সাথে পরিচয় হয়। ভাবলাম, এ সুযোগে সুন্দরবন অঞ্চলটা ঘোরা যাক। মেজর বোল্ট্‌কে বলে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে ওঁদের দলে ভীড়ে পড়ি।

সারাদিন ওঁরা জরিপের কাজে ব্যস্ত থাকেন। সন্ধ্যার পর তাঁবুতে জোর আড্ডা বসে। তাস, গল্প, সিনেমার কাহিনী, সাহিত্যের আলোচনা কত কি!

এক-একদিন ওঁদের মুখে শিকারের গল্প শুনতে শুনতে আমি তন্ময় হয়ে যাই। শ্রোতা হিসাবে পাশের গ্রামের দু'একজন তরুণও উপস্থিত থাকেন। জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বসু ও শর্মার বন্যপ্রাণীদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও প্রচুর। অভিজ্ঞ শিকারীও বটে।

বসু বিভিন্ন বনাঞ্চলে এ-পর্যন্ত আটটি বাঘ নিধন করেছেন আর শর্মা তো ব্যাঘ্রচর্মে বসে সকাল-সন্ধ্যা আহ্নিক করেন।

জরিপের শ্রমিকের সংখ্যা পনের। তার উপর ঠাকুর চাকর তো রয়েছে।

সেদিন ছিল শনিবারের সন্ধ্যা। আগামীকাল রবিবার। ছুটির আমেজ। কাজেই রাত্রে মুরগী সহযোগে ডিনারের ব্যবস্থা।

ঠিক হয় মুরগীর জন্য পাশের গ্রামে হরিধনকে পাঠানো হবে, আর কিছু আনাজ-তরকারিও কিনে আনবে।

বিকেল তিনটায় হরিধন থলে হাতে পাশের গ্রামে রওনা হয়।

মনে প্রচুর আনন্দ নিয়ে তাঁবুতে বসে আমরা চারজনে তাস খেলছি। কিন্তু আমাদের উল্লাস বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না।

সন্ধ্যার মুখে এই গ্রামের ছ'জন লোক ছুটতে ছুটতে এসে খবর দেয় যে, ওরা ছ'জন ও হরিধন একসঙ্গে আসছিল। একটু আগ-পিছু হতেই হরিধনকে আর দেখতে পায় না। একটা বোটকা গন্ধও নাকে ভেসে আসে। মনে হয় হরিধনকে বাঘে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

বসু বলেন: জীবনে অনেক হিংস্র জন্তু নিয়ে কারবার করেছি। সন্ধ্যার মুখে পাশাপাশি তিনজনের মাঝখান হতে বাঘ মানুষ ধরে খাবে, এ-কথা অবিশ্বাস্য।

লোক ছ'জনকে আশ্বাস দিয়ে বসু বলেন: সে নিশ্চয়ই পথ ভুল করেছে। দেখ গিয়ে, এতক্ষণে এসে পড়েছে।

সন্ধ্যা সাতটার পর যখন হরি ফিরে এলো না, তখন আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। এতো রাতে সন্ধান করা বিপজ্জনক তো বটেই, উপরন্তু গ্রামের লোকদের একত্রে জড়ো করা শক্ত।

সে রাত্রে আমরা কেহই ভাল ঘুমোতে পারি নাই। অন্য শ্রমিকদের মনে ভয় ধরে যাওয়াটা মোটেই ভাল নয়।

পরদিন ভোরে ওদের অভয় দিয়ে বসু, শর্মা ও আমি হরিধনের সন্ধানে যাওয়াই স্থির হয়।

তিনজনে ছুটি রাইফেল কাঁধে নিয়ে রওনা হই। ধরে নেই হরিধনকে বাঘে ধরে নিয়ে গিয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলে নদী ও খাড়ির সংখ্যা অজস্র। সেক্ষেত্রে তাকে নদীর কাছাকাছি কোনো স্থানে নিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। এরূপ অনুমান করে আমরা নদীর দিকেই রওনা হই।

বন অত্যন্ত নিবিড়—সুন্দরী গাছ, জারুল, হিজল ও বন্য লতার ঘন

পাতায় রৌদ্র ও আলোকের পথ প্রায় রুদ্ধ। বহু কষ্টে কাঁটা গুল্ম, শুষ্ক পত্র ও ভাঙা ডালপালা সরিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি।

বহুক্ষণ অনুসন্ধানের পর আমাদের দেহ মন উভয়েই ক্লান্ত। হঠাৎ সামনের ঝোপের পাশে বাঘের পায়ের টাটকা ছাপ দেখতে পাই। ছাপ দেখে মনে হয়, বাঘটা প্রকাণ্ড। আশেপাশে চাপ চাপ রক্ত—ঠিক মেজেন্টের রঙের মত। একটু দুর্গন্ধও নাকে ভেসে আসে।

বনের মধ্যে একটি স্থান ডোবার মত দেখতে, বর্ষার জল তাতে সঞ্চিত হয়েছে। রৌদ্র, আলো, বাতাস প্রবেশ করতে না পেরে শুকনো পাতা পচে দুর্গন্ধময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। দেখি ডোবার ডান দিকে ঝোপের গা ঘেঁষে অর্ধ-ভুক্ত নরদেহ। পেটের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে।

বন্ধু চুপিচুপি বলেন: ঐ তো হরিধনের ডোরাকাটা ফতুয়া।

কোমর হতে দেহের নিচের অংশ লতাপাতা ও ডালাপালায় ঢাকা। পাছে শকুন, শেয়াল প্রভৃতি প্রাণীরা বাকি অংশটুকু খেয়ে ফেলে বলে বাঘের এই সতর্ক ব্যবস্থা।

সন্তর্পণে বন্ধু, শর্মা ও আমি অর্ধভুক্ত দেহটার দিকে এগিয়ে যাই। লোকটার মুখের দিকে চেয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠি। সেই ভীষণ দৃশ্য আমি জীবনে কখনো বিস্মৃত হতে পারব না। চোখ দুটি নিষ্পলক, একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্কের ভাব যেন তখনো চোখে মুখে ফুটে রয়েছে।

সাবধানে গুড়ি মেরে ঝোপের ভেতর চেয়ে দেখি, বাঘের কোনো চিহ্ন নেই। এখানে সেখানে টুকরো টুকরো বিক্ষিপ্ত মাংস। আমরা ঠিক করেছিলাম তিনজনে ধরাধরি করে অবশিষ্ট দেহটা তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে সৎকারের ব্যবস্থা করি। কিন্তু ভেবে দেখি তা সম্ভব নয়। কারণ তাঁবু এখান হতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। অথচ হরিধনকে ধরে নিয়ে গিয়েছে তাঁবুর খুব কাছ থেকেই। উপরন্তু অর্ধভুক্ত দেহটা তাঁবুতে নিয়ে গেলে শ্রমিকেরাও ভয় পাবে।

ব্যথিত হৃদয়ে দুপুরের আগেই তাঁবুতে ফিরে আসি। আমাদের

সৌভাগ্য যে পথে কোনপ্রকার বিপদ ঘটে নাই।

পাঁচ মাইল দূরে আজ যখন নরখাদক বাঘের আস্তানা স্বচক্ষে দেখে এসেছি, তখন তাঁবুর আশেপাশে বাঘের আগমন একেবারে অসম্ভব নয়।

সন্ধ্যার পর মিঃ বসু সব শ্রমিকদের সাবধান করে দিয়ে বলেন যে তাঁবুর চারপাশে যেন আগুন জেলে রাখা হয়। আর চৌকিদার দু'জন রাইফেল সহ সজাগ দৃষ্টিতে যেন পাহারা দেয়।

চৌকিদার দু'জন সমস্বরে বলে: দেড় মাহিনা হুগা, আভিতক্ একটোও শের্ নাহি দেখা।

আশ্চর্য! সেই রাত্রেই বাঘ এলো।

সবাই আমরা তখন গভীর ঘুমে নিমগ্ন। পাশের তাঁবুগুলো হতে নাক ডাকার শব্দ কানে ভেসে আসে। মশা মারার চড়-চাপড়ও দু'একটা শোনা যায়।

হঠাৎ সমবেত আর্তনাদ! প্রত্যেক তাঁবু হতে শ্রমিকরা চিৎকার করে বলে: বাঘ, বাঘ! নরেনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

নরেন ছিল আমাদের রাঁধুনী। রান্নাঘরের পাশের তাঁবুতেই বাঘ ঢুকে।

মিঃ বসু, শর্মা ও আমি একটি তাঁবুতে শুয়ে আছি। বাঘ যে আসবে তা আমি জানতাম। কারণ এরূপ ঘটনা আমি পূর্বে আরও প্রত্যক্ষ করেছি।

বসু আমাকে হ্যারিকেন ধরাতে বলে রাইফেল হাতেই বেরিয়ে গেলেন। তারপর আমি ও শর্মা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হই।

প্রত্যেকের চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

আর অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত নয় ভেবে বসু, শর্মা ও আমি যে পথে বাঘ নরেনকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, সে পথে রওনা হই। দুজনের হাতে দুটি রাইফেল। আমার হাতে পাঁচ-ব্যাটারীর শক্তিশালী টর্চ। বসুর হাতেও একটা।

হৈ-হল্লার মধ্যে বাঘ বোধহয় এখনো বেশীদূর যেতে পারেনি। উপরন্তু নরেনের এই বিশাল দেহকে টেনে নিয়ে যাওয়া বাঘের পক্ষে একটু কষ্টদায়ক। নরেনকে জীবিত পাওয়াও অসম্ভব নয়।

আমাদের অনুমানই ঠিক।

কিছুদূর এগোতেই একটি ঝোপের আড়ালে গোঙানির আওয়াজ পাই। গিয়ে দেখি নরেন। তাঁবু হতে তার দূরত্ব একশ' গজের মধ্যে।

নরেন ছিল খুব শক্তিশালী, গাট্টাগোট্টা। নরেনকে যখন বাঘে ধরে নিয়ে যায়, তখন নরেন বাঘের সাথে যে লড়েছিল, তার প্রমাণ আমরা পেয়ে যাই। একটি মোটা কাপড়ের জামাও তার গায়ে ছিল। ফলে তার পিঠের ক্ষত খুব গভীর হতে পারে নাই।

প্রাথমিক চিকিৎসার পর ভোরে শহরের হাসপাতালে নরেনকে পাঠাবার ব্যবস্থা করে আমরা তিনজন বেরিয়ে পড়ি। এভাবে অদৃশ্য শত্রুর পেছনে ধাওয়া করা যুক্তিসঙ্গত কিনা ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না। তবুও আমরা নালার ধার দিয়ে অতি সাবধানে এগিয়ে চলি।

প্রায় কয়েক ঘন্টা জঙ্গলে ঘুরেও বাঘের কোনো খোঁজ পাই নাই।

তাঁবুতে ফিরে আসি।

তিনজনে পরামর্শ করে ঠিক করি, তিন-চার দিন অপেক্ষা করে দুপুরের দিকে কতকগুলো গরু, ছাগল জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর আমরা তিনজন ঝোপ-ঝাড়ওয়ালা গাছে বসে লক্ষ্য রাখব।

তিন-চার দিন খুব সাবধানে প্রায় না ঘুমিয়েই তাঁবুতে কাটাই, শ্রমিকদেরও সাবধান করে দেই।

তিন-চার দিন অপেক্ষা করার কারণ—পাঁচদিন আগে বাঘ হরিধনের মাংস খেয়েছে। একটু ক্ষুধার্ত না হলে বাঘ কি আবার আহারের সন্ধানে বের হবে? উপরন্তু বাঘ বুঝে গিয়েছে আমরা খুব সাবধান হয়ে গিয়েছি। দ্বিতীয় কারণ—একটি বাঘ এক রাখাল বালকের ছাগলকে দিন করেক আগে তাঁবুর নিকটবর্তী খাড়ির মুখে ধরার চেষ্টা

করে। রাখাল বালকের চিৎকারে মধুসংগ্রহকারী জনা দশেক লোক উপস্থিত হওয়ায় বাঘটি চম্পট দেয়। বাঘটি দেখতে নাকি বিরাট।

চম্পট দেওয়ার কারণ—বাঘের বিশেষ ক্ষিধে ছিল না। আর নরেনকে ধরার কারণ বাঘটি মানুষখেকো বলে।

নির্দিষ্ট দিনে প্ল্যান অনুযায়ী কতকগুলি গরু ও ছাগল খাড়ির মুখে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। গরু ও ছাগলগুলি প্রথমে ভয়ে জঙ্গলে ঢুকতে চায় না। কোথাও একটা মচ্‌মচ্‌ আওয়াজ অথবা পাখির নড়াচড়ার শব্দে লেজ গুটিয়ে গ্রামের দিকে দৌড় দেয়। অনেক কষ্টে আবার তাদের জঙ্গলের মধ্যে একটা সুবিধাজনক জায়গায় নিয়ে এসে ছেড়ে দেওয়া হয়।

আমরা তিনজন তখন দুটি ঝোপ-ঝাড়ওয়ালা গাছে আত্মগোপন করে বসে আছি। আমার গাছে ছিলেন মিঃ বসু। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন অভিজ্ঞ শিকারী। শর্মা ছিলেন আর একটি গাছে।

গরু ও ছাগলগুলি কচি ঘাসপাতা পেয়ে তখন আহারে নিমগ্ন।

সূর্যের তেজ ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। বেলা প্রায় চারটের কাছাকাছি। আমরা যেখানে বসে আছি তার ডানদিকে নালার এপারে ঝোপ-ঝাড়ওয়ালা কাঁটা ঝোপ ও নল খাগড়ার বন। হঠাৎ যেন কাঁটাঝোপের বনটা নড়ে উঠে। বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। মাটিতে পাথরের টুকরো খসে পড়ার শব্দও কানে আসে। হামাগুড়ি দিয়ে বাঘটা আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। সামনের বলিষ্ঠ বলদের দিকেই তার লক্ষ্য। এবার আমরা বাঘের মাথাটা স্পষ্ট দেখতে পাই।

বসুও নড়েচড়ে উঠেন। বাঘটি যেই লাফ দিতে যাবে অমনি বসুর রাইফেল গর্জে উঠে। নিখুঁত লক্ষ্য—পাকা শিকারীর মত।

গুলি খেয়ে বাঘটি বিকট গর্জন করে পাশের ঝোপে এলিয়ে পড়ে। দ্বিতীয় গুলি আর খরচ করতে হয়নি।

বাঘের গর্জন আর রাইফেলের গুলির শব্দে গরু ও ছাগলগুলি ঊর্ধ্বশ্বাসে গ্রামের দিকে পালায়। ভীত, সন্ত্রস্ত, প্রাণে বাঁচার আশায়

প্রাণীগুলির দৌড়ানোর দৃশ্য দেখে মনে করুণা জাগে।

কয়েক মিনিট পর আমরা গাছ থেকে নেমে আসি। বন্ধুকে বলি: এটা যে সেই নরখাদক বাঘ, তার কিন্তু কোনো প্রমাণ নেই। অন্য বাঘও হতে পারে।

বন্ধু বলেন: কথাটা অতি সত্যি।

এরপর আমি আরো দিন সাতেক ঐ অঞ্চলে ছিলাম। কিন্তু কোনো বাঘের উপদ্রবের সংবাদ পাই নাই অথবা আশেপাশের গ্রামে কোনো জন্তু বা মানুষ মারা পড়ে নাই।

বাঘটি ছিল ১০ ফুট ৮ ইঞ্চি।




বাঘের
কবলে

বাল্যকাল হতেই গৌরীশের সাথে আমার পরিচয়। আমাদের বন্ধুত্ব অত্যন্ত নিবিড় এবং আমরা প্রায় সমবয়সী।

আসামে থাকাকালীন স্বর্গত রাজা গিরীশচন্দ্র রায়ের পৌত্র রায় রায়ান গৌরীশের সঙ্গে বহু বন-জঙ্গল ঘুরে বেড়িয়েছি। একবার তাদের জমিদারীর কাছারিবাড়ি রাজারামপুর হতে পুব-পাহাড়ে যাই শুয়োর শিকার করতে।

আমি বরাবরই সখের শিকারি। শিকারীদের সাথে ঘুরে বেড়ানো আর জন্তু-জানোয়ারের জীবনযাত্রা স্টাডি করাই আমার উদ্দেশ্য।

প্রতি বছরই পুব পাহাড়ে ওদের কিছু জমিতে আখ লাগানো হয়। সন্ধ্যার মুখে শুয়োরের পাল প্রায়ই আখক্ষেতে ঢুকে আখ নষ্ট করে দিয়ে যায়। চৌকিদারের রিপোর্ট।

ঠিক হয়, আজ সন্ধ্যার পরই শুয়োর নিধন করা হবে।

রাজবাড়ির হাতি চড়ে আমি, গৌরীশ, মাহুত ও বিশ্বস্ত চৌকিদার বনমালী আখক্ষেতের দিকে রওনা হই।

সঙ্গে গৌরীশের ৪০৫ বোরের শক্তিশালী রাইফেল। আমি নিরস্ত্র, হাতে পাঁচ ব্যাটারির একটি টর্চ। বনমালীর নিকট নেপালী কুক্‌রী ও লাঠি।

সমতল ভূমি ছেড়ে সবেমাত্র আমরা বনে ঢুকেছি, এমন সময় দেখি চার-পাঁচজন লোক আহত একজনকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে ত্বরিৎবেগে আসছে।

জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি, রাখাল (লোকটি) বনের প্রান্তে গরু চরাচ্ছিল। এমন সময় একটি বাঘ গরুর পাল হতে একটি গরুকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। তখন রাখাল বাধা দেয়। ফলে বাঘটি এক থাবায় রাখালের পিঠের একখণ্ড মাংস তুলে নেয়।

বনে কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটছিল। তারা এ ঘটনা দেখতে পায়। তাদের হৈ-চৈ ও চিৎকারে এবং গরুগুলির সমবেত আক্রমণে বাঘ গরুটিকে ছেড়ে পালিয়ে যায়।

বাঘ যখন মানুষ ছেড়ে গরুকে ধরেছে, তখন স্পষ্টই বোঝা যায়—বাঘটি মানুষখেকো নয়। আর সামান্য হৈ-চৈ-এ বাঘ যখন পালিয়েছে, মনে হয় খুব বড় আকারের বাঘ নয় এবং শিকারেও দক্ষ হয়ে উঠেনি।

কাঠুরিয়ারা গরুগুলিকে পাশের গ্রামে রেখে, রাখালকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। কাছেই ছোট একটি হাসপাতাল আছে।

গৌরীশ আমাকে ননীদা (ডাকনাম) বলে ডাকে। বলে : চল, বাঘটাকে ফলো করা যাক।...ফেরার পথে সময় থাকলে শুয়োর মারা যাবে।

বলি : মাত্র একটি রাইফেল। সন্ধ্যা হয়ে এলো প্রায়। এ অবস্থায় যাওয়া কি যুক্তিসঙ্গত ?

গৌরীশ অবশ্য পাকা শিকারী।

অবশেষে গৌরীশের উৎসাহেই আমরা বাঘের পেছনে রওনা হই।

হাতি সাধারণত বেত বনে যেতে চায় না। কিন্তু সামনেই বেত-বন। বেতবনের কাঁটা যে কি ভয়ানক, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। সে-কাঁটা ঠিক বড়শীর মত। গায়ে লাগলে মাংস তুলে নেয়। জামা-কাপড়ে লাগলে তাহা একেবারে ছিঁড়ে যায়। এ সব বনে খুব সাবধানে চলতে হয়।

অঙ্কুশের ঘা দিয়ে মাহুত হাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

খানিক গিয়ে দেখি, নরম মাটির উপরে বাঘের পায়ের টাটকা ছাপ। ছাপটি মাঝারি আকারের। সেই ছাপ অনুসরণ করে একটি ছোট নালার ধারে গিয়ে উপস্থিত হই। কিন্তু বাঘের কোনো চিহ্ন দেখতে পাই না।

একটু পরই আকাশে চাঁদ দেখতে পাই। নিস্তব্ধ বনভূমি চাঁদের আলোতে প্লাবিত হয়ে যায়—চারদিকে শ্যাম বৃক্ষপত্রে জ্যোৎস্না পড়ে

অপূর্ব শোভা ধারণ করে।

সময়টা শরতকাল। মাঝে মাঝে সাদা মেঘে চাঁদ দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। আর ঝোপঝাড় সব অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে কিরকম এক ভৌতিক চেহারায় রূপান্তরিত হয়।

হঠাৎ অদূরে কিসের যেন ঘেঁাৎ ঘেঁাৎ শব্দ ও হাড় চিবানোর স্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পাই। গৌরীশকে চুপিচুপি বলি—নিশ্চয়ই ঝোপের ভিতরে বাঘ রয়েছে।

গৌরীশের হাতে রাইফেল—কোনোরকমে সাবধানে আমরা সেই ঝোপের ভিতরে প্রবেশ করি। খানিকটা যেতেই দেখি, বেশ একটু পরিষ্কার জায়গা, তার মধ্যে তুটো শৃগাল গরু অথবা ছাগলের ঠ্যাং নিয়ে কামড়াকামড়ি করছে। সেটা যে বাঘের আস্তানা, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারি।

বাঘ মহাশয় বাড়িতে ছিলেন না। গরুটিকে ধরতে না পেরে হয়তো অন্য শিকারের সন্ধানে বের হয়েছেন। এই ফাঁকে সুচতুর শৃগালেরা সুবিধা বুঝে প্রভুর খাদ্যে ভাগ বসিয়েছে। সমস্ত জায়গা জুড়ে শুধু গরু-ছাগলের কঙ্কাল।

বেতবন ছেড়ে নালার পাশ দিয়ে আমরা রওনা হই। আবার বাঘের পায়ের টাটকা ছাপ দেখতে পাই। সামনেই একটু সমতল জায়গা। তারপর ডানদিকে ছনক্ষেত। ছনক্ষেতে বাঘের আত্মগোপন করা স্বাভাবিক। হাতির গতি যেন একটু মন্থর হয়।

মাহুত বলে: সার, সামনের ছনক্ষেতেই বোধহয় বাঘ আছে।

যেই আমরা নালাটির বাঁক ঘুরে ওপারে যাব, অমনি দেখি সামনের নালায় আড়াআড়ি বসে বাঘটি নির্বিবাদে জল পান করছে।

গুলি করার মত সুবিধা ছিল না। কারণ বাঘের পেছনের অংশ আমরা দেখতে পাই।

হঠাৎ বাঘ আমাদের অবস্থান জানতে পেরে বিকট গর্জন করে এক লাফে সামনের ছনক্ষেতে প্রবেশ করে।

আমাদের অনুমানই ঠিক। বাঘটি ছিল মাঝারি আকারের। গর্জনে বোঝা গেল বাঘের বাচ্চা বাঘই। গর্জনে মাটি যেন কাঁপছে।

সামনেই গভীর বন। হাতিও যেন ঐ পথে যেতে ইচ্ছুক নয়। রাতও ঘনিয়ে আসছে। চাঁদের আলো মাঝে মাঝে বেশ উজ্জ্বল, আ গার মেঘে ঢাকা পড়ে আকাশ এক-একবার অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে।

ঠিক করি, ফিরে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত।

সেই বেতবনের কাঁটাঝোপের পাশ দিয়ে ফিরছি। শৃগালদের কড়মড়িয়ে হাড় চিবানোর শব্দ আর কানে আসছে না।

গৌরীশকে কানে কানে বলি—বাঘ কি তার বাসস্থানে ফিরে এলো? শৃগালদের যে কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।

বেতঝোপের কাছাকাছি এসে একটু দাঁড়িয়েছি। অমনি মনে হল যেন শুকনো পাতার মচ্‌মচ্‌ শব্দ। কান পেতে শুনি পাতার শব্দই বটে। পথের ডানদিকে হাতিকে সরিয়ে নিয়ে চুপ করে দাঁড়াই। তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেলে স্পষ্ট দেখি, বেতঝাড়ের ঝোপে ঘাসের মাথা নড়ছে। তারপরই একটা মৃদু ঘড়্‌ ঘড়্‌ শব্দ শোনা যায়।

হাতি 'রায়ডাক' একটু নড়েচড়ে উঠে। 'রায়ডাক' অবশ্য বহু শিকারের অভিজ্ঞ দর্শক।

ঝোপটা আমাদের নিকট হতে দশ-বারো হাতের বেশি হবে না। বাঘ হয়তো লাফ মারবে নতুবা আমাদের সামনের রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যাবার মতলব করছে।

বাঘটার চলাফেরা দেখে মনে হয়, বাঘটা মানুষখেকো নয় এবং শিকারেও অভিজ্ঞ নয়।

যা ভেবেছিলাম তাই। বাঘটা ঠিক রাস্তার মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই বাঘের মুখে টর্চের ফোকাস ফেলি—জ্বলন্ত অঙ্গারের মত দুটো চোখ যেন জ্বল জ্বল করে উঠে। গৌরীশের রাইফেল সেই মুহূর্তেই গর্জে উঠে। অব্যর্থ লক্ষ্য।

গুলির ধোঁয়া মেলানোর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাই, বাঘ ধুলোয়

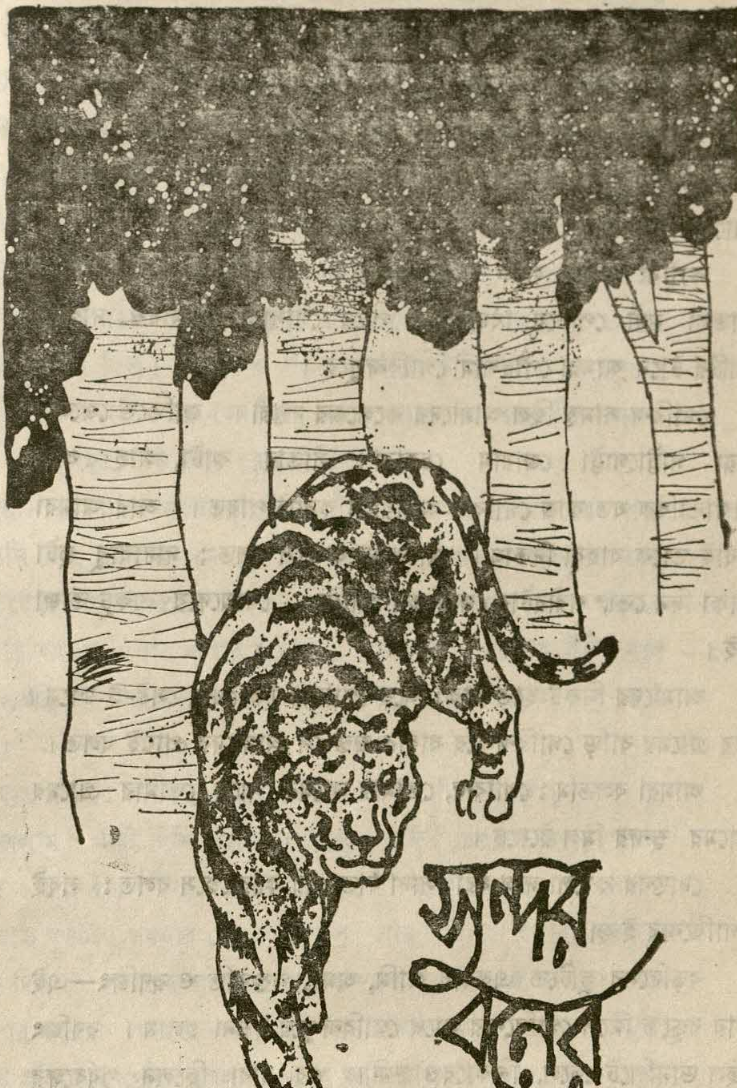
গড়াগড়ি দিচ্ছে আর যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে।

খানিক পরই বাঘটি একেবারে নীরব হয়ে যায়।

গুলিটা ঠিক বাঘের বুকে লেগেছিল। দ্বিতীয় গুলি করার আর সুযোগ হয়নি।

বাঘটি ছিল মাঝারি আকারের। দৈর্ঘ্যে ছয় ফুট সাত ইঞ্চি।




সুন্দর বনের বাঘ

বাঘের মুখ থেকে ফিরে এসেছি আমরা। গোবিন্দ সামন্তই ছিল বাঘের প্রথম টারগেট, অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছে। সে আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দীর আগেকার কথা।

ক্যানিং থেকে লঞ্চে চড়ে বাসন্তী। সেখান থেকে গোসাবা। মাতলা নদী পেরিয়ে বিদ্যাধরীর পারে গোসাবা। আরও দক্ষিণে ভাটির টানে আমরা পৌঁছলাম গোবিন্দপুরে।

গোবিন্দ সামন্ত ছিল আমাদের কলেজের দপ্তরী। জাতিতে জেলে। ইয়া গাট্টাগোট্টা জোয়ান চেহারা। সাঁতার কাটা, মাছ ধরা, অস্বাভাবিক যত কাজ গোবিন্দ অনায়াসে করতে পারত। আর আমরা সবাই তাকে বাহবা দিতাম। মাঝে মাঝে এসে বলত ; দাদাবাবু দুটা টাকা দিন তো, শরীরটায় জোর কম পাচ্ছি। খেয়েদেয়ে একটু তাজা হই।

আমাদের নিকট হতে টাকা নিয়ে গোবিন্দ কি খেত, সেই-ই জানে। ওর গ্রামের বাড়ি গোবিন্দপুরে যাবার জন্য সে আমাদের প্রায়ই বলত।

আমরা বলতাম : গোবিন্দ, তোমার নামের সাথে তোমার গ্রামের নামের সুন্দর মিল রয়েছে।

দোক্তার কালো দাগ-ধরা সাদা দাঁত বের করে হেসে বলত : সবই গোবিন্দের ইচ্ছা।

বড়দিনের ছুটিতে একবার আমি, অমর, পশুপতি ও রণজিৎ—এই চার বন্ধুতে মিলে গোবিন্দের সাথে গোবিন্দপুরে রওনা হলাম। রণজিৎ ছিল ডানপিটে ছেলে, শিকারেও দক্ষ। ওর বাবা ছিলেন পূর্ববঙ্গের বর্ধিষ্ণু জমিদার। বাবার দৌলতে একটি বন্দুকের লাইসেন্স ওর বরাতে জুটেছিল। হাতের টিপও ছিল অব্যর্থ। মাঝে মাঝে আমাদের নিয়ে সল্টলেকে সে পাখি শিকার করতে আসত। তখন সল্টলেক

জলে জলময়—সমুদ্রের দৃশ্য যেন। শীতের প্রারম্ভে নানাজাতের পাখি এসে সেখানে জমায়েত হত। সারাদিন আমরা হৈ-হল্লা করে বড়জোর দুটি কি একটি সরাইল পাখি নিধন করতাম। ভাগে দু' টুকরার বেশী মাংস পাতে পড়ত না। আর রণজিতের বন্দুক দিয়ে আমরা হাতের টিপ প্র্যাকটিস্ করতাম। তখন কার্তুজের দাম খুবই অল্প ছিল। অমর ভয়ে বন্দুকের ঘোড়ায় হাত দিত না। সে শুধু আমাদের উৎসাহ দিত আর বই-পড়া নানা এ্যাডভেঞ্চারের গল্প বলত।

আমি ও রণজিৎ ছিলাম পদ্মাপারের ছেলে, খাঁটি বাঙ্গাল। ভয়ডর আমাদের কমই ছিল। অমর ও পশুপতি খাঁটি টিপিক্যাল কলকাতার ঘটি। মাতলা নদী বেয়ে যখন লঞ্চ চলছে অমর ও পশুপতি বলল: বাবা, এ যে সমুদ্র, লঞ্চ ডুবে যাবে না তো?

আমি ও রণজিৎ একসঙ্গে চেঁচিয়ে উত্তর দিলাম: চাঁদপুরের পদ্মা দেখিসনি তো, যেখানে মেঘনা এসে মিলিত হয়েছে। এপার হতে ওপার দেখা যায় না, প্রস্থে পনের-ষোল মাইলের কম তো নয়। গয়নার নৌকোয় আমরা এপার ওপার হয়েছি। জেলের নৌকোয় ইলিশমাছ ধরা দেখেছি। আর মাতলা নদী দেখে তোরা একেবারে মাতাল হয়ে গেলি।

অমর বলল: গয়নার নৌকো, সেটা আবার কি জিনিস?

বললাম: খাঁটি দিশি জিনিস। মেড বাই (made by) পদ্মা-পারের কাঠমিস্ত্রি। ইয়া বড় বড় নৌকো। ধরো স্টিমারের প্যাসেঞ্জার নিয়ে রাত দশটায় গয়নার নৌকো ছাড়ল আর ভোরে পদ্মার ওপারে পৌঁছে দিল। ঝপাং ঝপাং করে দাঁড় ও পাল তুলেই এই নৌকো পদ্মা পারাপার করে। অথবা নারায়ণগঞ্জ ঘাট থেকে ছাড়ল ভোর হবার আগেই বরিশালে পৌঁছে গেল। যখন আড়িয়াল খাঁ নদীর মাঝ দিয়ে যায়, তখন কেহ বলেন 'আল্লা' কেহ বা ভগবানের নাম স্মরণ করেন। নৌকোর সাইজ বুঝে লোক ধরে চল্লিশ-পঞ্চাশ হতে আশি জনের মতন। নানা গ্রামের নানা জাতের লোক। কেউই কারোর পরিচিত নয়।

তাসের আড্ডা, ভাটিয়ালী গান বা গল্প বলেই কেহ কেহ সারারাত কাটিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের মধ্যে পূর্ব পরিচয়ের গন্ধ থেকে রসালাপও জমে উঠে।

অমর ও পশুপতি আমাদের কথা শুনে থ' বনে গেল। উভয়েই বলল : বরাতে নেই, সামনের পুজোর ছুটিতে বেনারস যাচ্ছি। তা না হলে তোদের সাথে গিয়ে পদ্মার পারের দেশ দেখে আসতাম। বহু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও গেলাম না, বড় আপশোষ রয়ে গেল।

বললাম : রামপালের কলা, ফতুল্লার চিড়া, ব্রাহ্মণ-বাড়িয়ার মাডা (দই-টানা সরবৎ), সিলেটের সুমিষ্ট কমলা, পদ্মার উপাদেয় ইলিশ আর ইয়া বড় বড় চিংড়ি মাছ কিছুই তোমাদের খাওয়াতে পারলাম না। আর বর্তমানে পদ্মাপারের দেশ (বাংলাদেশ) তো ভিন্‌দেশ হয়ে গিয়েছে। আমাদের আত্মীয়-স্বজন আর ওখানে কেহ নেই। তাছাড়া সেই চার্মও নেই।

পদ্মার বুকে প্রকাণ্ড স্টিমার 'ঈগল' চলেছে। চাকার একটানা ঝপ্ ঝপ্ শব্দ। শ্রেণীবদ্ধ পালতোলা নৌকোর মিছিল, পারে উলঙ্গ ও অর্ধ-উলঙ্গ শিশুদের নৃত্য, জেলেদের ইলিশ মাছ ধরার দৃশ্য, ভাগ্যকুল রাজাদের মন্দির, টেপাখোলা স্টিমার স্টেশনে পদ্মপাতায় রসগোল্লা (চার পয়সায় চারটি) সেবন সব মিলিয়ে এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি করত। তারপর দুপুরে পদ্মার জলে স্নান সেরে স্টিমারে বসে মুরগির মাংস সহযোগে আহার—সেই মাংস ও ভাতের কি যে আস্বাদন, আজও জিভে জল এসে যায়। উপাদেয় ফাইন চালসহ মাংস, ডাল, ভাজা, চাটনি—মাত্র বারো আনা। যাক্ সে কথা ভাবতে গেলে মনটা বড় বিষণ্ণ হয়ে পড়ে।

নির্দিষ্ট দিনে এসে আমরা গোবিন্দপুর গ্রামে পৌঁছে গেলাম। ছোট গ্রাম, কয়েক ঘর লোকের বাস। এখন আমাদের গোবিন্দই একমাত্র ভরসা।

মাটি দিয়ে নিকানো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কুঁড়েঘরে আমাদের থাকার

ব্যবস্থা হল। ছোটবড় দুটি চৌকি পাতা। একত্রে জোড়া দিয়ে আমরা থাকার ব্যবস্থা করে নিলাম। বন্দুকটি বিছানার নিচে সাবধানে রাখা হল।

গোবিন্দ, তার স্ত্রী ও ছেলেটি আমাদের যত্নের কোনো ত্রুটি করে নাই। দু'তিন ঘণ্টা অন্তর চা-বিস্কুট আর মুড়ি-নারকেলসহ গরম বেগুনী আমাদের রসনাকে পরিপূর্ণ তৃপ্তিই দিয়েছিল।

মাঝে মাঝে রণজিৎ মন্তব্য করছিল: সবই গোবিন্দের ইচ্ছা।

একদিন গোবিন্দপুর গ্রামে বিশ্রাম নিলাম। গ্রামের আশেপাশে সব দেখে বেড়ালাম। আমি ও রণজিৎ কিন্তু ছিপ হাতে এই পুকুর, ঐ ঝিল ঘুরে ঘুরে মাছ ধরেছিলাম প্রচুর। পশুপতি রান্না করতে পারত ভাল। ওর নির্দেশে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা খুব ভালই হয়েছিল।

পরদিন ভোরে আমরা চারটি নৌকো করে বিদ্যাধরী নদীর খাড়িতে বোধহয় মধুঝিলের চরে গেলাম। গোবিন্দপুর হতে মধুঝিলের চর প্রায় আট-দশ মাইল দক্ষিণ-পুবে। চরের নামটি আজ ঠিক মনে নেই—মধুঝিলের চরই হবে হয়তো।

দু'নৌকোয় আমরা আর বাকী দু'নৌকোয় জেলেরা। আমাদের নৌকোয় মজবুত ছাউনি ও দরজা ছিল। জেলেদের নৌকো ছিল খোলামেলা। খাওয়া-দাওয়ার সব বন্দোবস্তই ছিল। সারাদিন সারারাত মাছ ধরে পরের দিন ফিরে আসার কথা।

নৌকো আমাদের কখনো কখনো পার ঘেঁষে চলে। উভয় পারই গভীর জঙ্গল। সুন্দরী গাছ খুব কমই চোখে পড়ল। যদিও আমরা সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে চলেছি। নাম না-জানা অগুনিত গাছ। গরাণ গাছই বেশি।

অমর ও পশুপতিকে দেখলাম যেন একটু বিমর্ষ ও ভীতু চাহনি। ওরা উভয়েই আমাদের গা-ঘেঁষে বসল। বলল: ভাই, বাঘ কি এসে আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে পারে?

আমি ও রণজিৎ জোরের সহিত বললাম: অবকোরস্ (obcourse)।

যদি ক্ষুধার্ত বাঘের ক্ষুধার উদ্রেক হয়ে থাকে অথবা মানুষখেকো হয়। তবে দিনের বেলায় সাধারণত এ ঘটনা ঘটে না। কারণ বাঘ নৈশপ্রাণী —রাতের আঁধারেই আহারের সন্ধানে বের হয়।

রণজিৎ বলল: অর্ধেন্দুকে জিজ্ঞেস কর—ও বাঘ, হাতি, গণ্ডার, কুমির ইত্যাদি সম্বন্ধে এক্সপারট্ (Expert) লোক।

আমি বললাম: প্রথমত বাঘ কখনো মানুষ খায় না। বাঘ মানুষ খায় কখন, যখন সে বৃদ্ধ হয়ে যায়। বন্যপ্রাণী তাড়িয়ে ধরতে পারে না, তখন লোকালয়ে এসে গরু-বাছুর, ছাগল, ভেড়া ধরে খায়। তারপর গৃহস্থের ছোট ছেলেমেয়ে বাঘের শিকার হয়। বাঘ একবার মানুষের মাংসের স্বাদ পেলে মানুষখেকো হয়ে উঠে।

দ্বিতীয়ত কোনো অপক্ক বা নতুন শিকারী কোনো বাঘকে আহত করেছে, নিধন করতে পারেনি। বাঘের তো আর বিধান ডাক্তার নেই অথবা মেডিকেল কলেজ নেই। কাজেই বাঘ স্বাভাবিকভাবে ক্রমে ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠে। সুস্থ হবার পর বাঘ ভাবে দু-পেয়ে মানুষ-গুলো আমার শত্রু। মানুষ দেখলেই সে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। ক্রমে ক্রমে সে মানুষখেকো হয়ে যায়।

সাধারণত সুন্দরবনের বেশিরভাগই বাঘ বংশপরম্পরায় মানুষখেকো। তার অবশ্য ভৌগোলিক কারণ ও অন্যান্য ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। সুন্দরবনে দুটি প্রাণী মাংস খেয়ে জীবনধারণ করে।

বলত অমর, কি কি প্রাণী? বলতে পারলি না তো?

বললাম: বাঘ ও কুমির।

সুন্দরবনে একদা প্রচুর হরিণ, শুয়োর, বানর, খরগোস, নানা জাতের পাখি ইত্যাদি প্রচুর ছিল—যা বাঘ ও কুমিরের খাদ্য। সৌখিন শিকারী ও মধু সংগ্রহকারীদের কৃপায় বহু হরিণ, শুয়োর ইত্যাদি নিধন হয়েছে। তাছাড়া বাঘ ও কুমির উক্ত জন্তুগুলি খাওয়ার ফলেও ক্রমশ ওদের সংখ্যা লোপ পেয়ে গিয়েছে। বাঘ ও কুমিরের খাদ্যাভাবের জন্য বাঘ গভীর জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে এসে মানুষ ধরে খেতে শিখেছে

এবং বংশপরম্পরায় মানুষখেকো হয়ে উঠেছে।

যদি সুন্দরবন অঞ্চলের সাথে হিমালয় পর্বতের যোগাযোগ থাকত, তবে বাঘ অনায়াসে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ডুয়ার্স অঞ্চলে হাজির হত এবং সেখান থেকে খাদ্যের সন্ধানে আসাম-বার্মা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ত। সে-সুযোগ না-থাকায় সুন্দরবনের বাঘ সুন্দরবনেই আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। সুন্দরবনের সব বাঘই মানুষখেকো—এটা আমি বিশ্বাস করি না। তবে সুন্দরবনের অধিকাংশ বাঘই মানুষখেকো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সারাদিন গোবিন্দের দল মাছ ধরল। নৌকোয় রান্না-বান্না, খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম সবই নির্বিঘ্নে শেষ হল।

বাঘ মামাদের শ্যেন দৃষ্টি হতে দূরে থাকার জন্য সন্ধ্যার পর নৌকো চারটি মাঝনদীতে নোঙর ফেলল। কারণ, পারের কাছে নোঙর করলে রাত্রে যদি বাঘ মামা নৌকোয় লাফিয়ে পড়ে, তবে বিপদ ঘটা স্বাভাবিক।

আমরা চার বন্ধুতে একটি ছাউনি-ঘেরা নৌকোয় শয়ন করলাম, আর ছাউনির ভেতর আমাদের দরজার সামনে গোবিন্দ 'জয় দুর্গা' বলে শুয়ে পড়ল। শুধু আমাদের নৌকোয় গলুই বরাবর ছোট একটি জানালা খোলা। সেই জানালা দিয়ে একটি কুকুরের মাথা ঢোকে কিনা সন্দেহ।

অন্যান্য মাঝি ও জেলেরা আমাদের ছাউনি-ঘেরা দ্বিতীয় নৌকোয় শয়ন করল। অবশিষ্ট নৌকো দুটো মাছ বোঝাই হয়ে নদীতে ভাসতে লাগল।

পার থেকে অন্তত প্রায় পোয়া মাইল দূরে আমাদের নৌকো। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া। লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে আমরা তখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

প্রথমে হঠাৎ আমাদের নৌকোটা দোলে উঠল। আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়িতে দেখলাম চারটে বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। গোবিন্দও জেগে উঠল। বলল: দাদাবাবু বোধহয় জোয়ার এলো।

জানালার মুখেই গোবিন্দের মাথা ছিল। এপাশ থেকে ওপাশ ফিরেছি। দেখি জানালার মুখে জ্বলজ্বল করছে দুটো জলন্ত অঙ্গার। বাঘ মামা উবু হয়ে বসে আছেন সুযোগের অপেক্ষায়। এখন বুঝলাম ক্ষণিক আগে নৌকোটা দোলে উঠেছিল কেন। বাঘ মামা নিস্তব্ধে সাঁতার কেটে এসে গলুই ভর দিয়ে নৌকোয় আরোহণ করেছেন।

কি সাহস!

রণজিতের পাশ থেকে বন্দুকটা টেনে নিয়ে এলাম। রণজিৎও জেগে উঠল। কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে বললাম: নৌকোর গলুইতে বাঘ। তাড়াতাড়ি গুলি বের কর।

গুলির কথা শুনে অমর ও পশুপতি তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। আর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমাকে জড়িয়ে ধরল। বাঘ ততক্ষণে দাঁড়িয়ে উঠে দরজার মুখে এক থাবা মেরে দরজা ভাঙবার চেষ্টা করল। দরজাটার কবজা ভেঙে ফাঁক হয়ে গেল। মাঝি ও জেলেদের হৈ-চৈ চিৎকার শুনে বাঘ বেগতিক দেখে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার শুরু করে দিল।

দরজা খুলে পাঁচ ব্যাটারীর টর্চের ফোকাসে বাঘের মাথা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। রণজিৎ অন্ধকারে চাবি খুঁজে সুটকেসটা খুলতে খুলতে বাঘ ততক্ষণে সাঁতার কেটে তীরে গিয়ে প্রায় পৌঁছেছে। নিশানা ঠিক করে রণজিৎ অবশ্য বাঘের মাথা লক্ষ্য করে বন্দুকের ঘোড়া টিপল বটে। নৌকোর দোলাতে গুলি বোধহয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। বাঘ ততক্ষণে নিরাপদে জঙ্গলে আত্মগোপন করেছে। দূরের জঙ্গলে বাঘের গুরু গুরু আওয়াজ কানে ভেসে এলো।

সত্যিই সুন্দরবনের বাঘের কি সাহস! সাঁতার কাটতে দেখলাম খুব এক্সপার্ট—বিচক্ষণ সাঁতারু বটে।

অবশিষ্ট রাত আমরা গল্পগুজব করে ও তাস খেলে কাটালাম। মাঝিরা মাঝে মাঝে টর্চের আলো ফেলে পাহারার কাজ করল।

ভোর হলে আমি ও রণজিৎ পার বরাবর বাঘের পায়ের দাগ অনুসরণ করে খানিকটা জায়গা অনুসন্ধান চালালাম। যদি গুলি

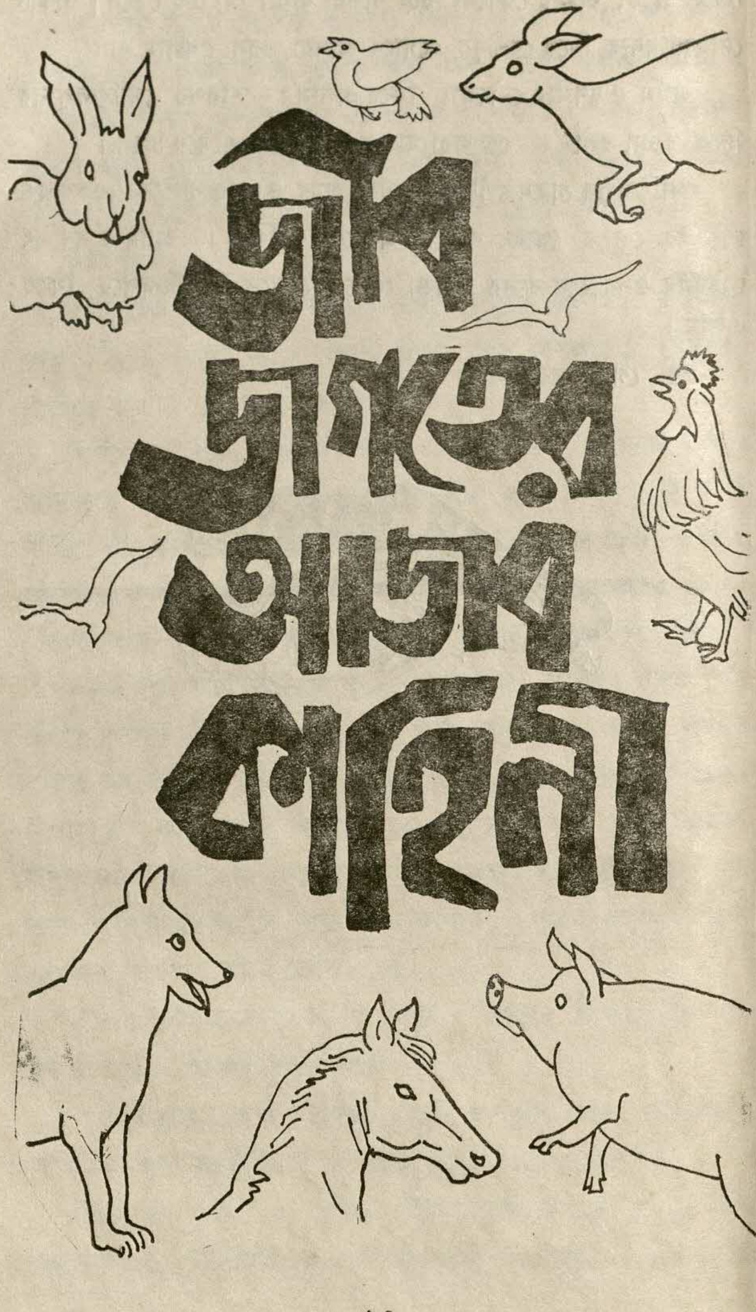
লেগে থাকে, রক্তের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা এই ভেবে। একটি দোনলা বন্দুক নিয়ে বেশীদূর এগোবে আমরা ভরসা পেলাম না।

আমি ও রণজিৎ নৌকোয় ফিরে এলাম। তারপর গোবিন্দপুরের দিকে রওনা হলাম। জেলেরা মাছ ধরতে ধরতে এগিয়ে চলল।

গোবিন্দপুর গ্রামে পৌঁছনো পর্যন্ত অমর ও পশুপতিকে একবারও ছাউনির ভেতর থেকে বাইরে আসতে দেখিনি। আমি ও রণজিৎ ছাউনির ওপর বসে বনের শোভা দেখতে দেখতে গোবিন্দপুরে ফিরে এলাম।

সবই গোবিন্দের ইচ্ছা।




জীব
জগতের
আজব
কাহিনী

সৌন্দর্য-ভরা এই পৃথিবীতে কত রকম প্রাণীর বাস, তা হয়তো অনেকের জানা নেই। বিচিত্র পৃথিবীতে বিচিত্র রকমের জীবজন্তু, পোকা-মাকড় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

ডাঙ্গায় কেঁচো যখন এঁকেবেঁকে চলে, দেখতে ভারী কুৎসিত লাগে। মাড়িয়ে বা কোনো কারণে কেঁচো তু'টুকরো হয়ে গেলে আশ্চর্য, কেঁচোটি মরে যায় না। তুই অংশে তুটি কেঁচো হয়ে যায়। ইহাদের চোখ নাই।

সমুদ্রের জলে তারামাছ নামে একজাতীয় মাছ আছে। তাদের শরীরের কোন অংশ ছিঁড়ে গেলে, সেই অংশটিই একটি আস্ত তারামাছ হয়ে যায়।

'স্প্রীং টেল্' (spring tail) নামে একপ্রকার ক্ষুদ্র পেটুকে পোকা আছে। এক সপ্তাহে নিজের দেহের ওজনের ২০,০০০ গুণ খাবার এরা খেয়ে ফেলে। এই অসাধারণ খাবার ক্ষমতার জন্য এদের প্রচুর আদর। সহরের ড্রেনের জলে ঘন আঠাল রকমের একপ্রকার ময়লা জমে। একবার 'পেটুকে পোকা' হাজার হাজার ছেড়ে দিলে, খেয়েই সব ময়লা এরা শেষ করে দিতে পারে। প্রতি সপ্তাহে এক-একটি ক্ষুদ্র পোকা তুই সের ময়লা খায়। কলকাতায় বর্তমান ড্রেনের ময়লা পরিষ্কার করা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েক হাজার 'পেটুকে পোকা' কলকাতার ড্রেনে ছাড়লে, শহরে আর জল জমবার ভয় থাকবে না।

সাধারণত পাখিরাই মাকড়সা ধরে খায়। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রাজিল দেশের গভীর অরণ্যে একপ্রকার বড় জাতীয় মাকড়সা আছে, তারা ছোট ছোট পাখি, ইঁতুর প্রভৃতি ধরে ধরে খায়। হিংস্র ব্যাঘ্রের মত এরা শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পাখিরা সাধারণত গাছে বাস করে। মানুষকে গাছে বাস করতে

দেখেছ কি? আসামের (বর্তমানে অরুণাচল). তিরাপ অঞ্চলে গভীর জঙ্গলে পাহাড়ী মানুষেরা জন্তু-জানোয়ারের হাত হতে রক্ষার জন্য গাছের মধ্যভাগে ঘর বেঁধে বসবাস করে।

কোনো মাছ গাছে বাসা বাঁধতে শুনেছ কি? 'স্পিডিল্' নামে এক-প্রকার মাছ আছে। দেখতে অনেকটা আমাদের কই মাছের মত। কানকোয় ভর করে জলের ধারে ছোট ছোট গাছে এরা উঠে পড়ে। জলের শ্যাওলা ও ঘাসকুটা দিয়ে এরা গাছের ডালে বাসা বাঁধে ও ডিমে তা দেয়।

কোন্ জীব দেখতে পায় না, একেবারে জন্মান্ধ?—উইপোকা ও কেঁচো।

চোখ দিয়ে শোনে কারা?—মাছ।

জিভ দিয়ে ও স্পন্দন অনুভব করে শ্রবণ করে কারা?—সাপ।

ময়ূরের পেছনে কয়টি পালক?—১৮টি।

কোন্ জন্তু বোবা?—জিরাফ।

কোন্ কোন্ দেশে সিংহের বাস?—আফ্রিকা আর ভারত। পৃথিবীতে আর কোথাও সিংহ নাই।

কোন্ দেশে গণ্ডার দেখতে পাওয়া যায়?—আফ্রিকা ও ভারত। নেপালেও কিছু গণ্ডার দেখা যায়। পৃথিবীতে আর কোথাও গণ্ডার নাই। আফ্রিকার গণ্ডারের দুটি ও ভারতের গণ্ডারের একটি খড়্গ থাকে।

দক্ষিণ আমেরিকায় পুমা নামে একপ্রকার হিংস্র জন্তু আছে। জীবতত্ত্ববিদদের মতে এরা সিংহ জাতীয়। আশ্চর্য, এরা মানুষকে অত্যধিক ভালবাসে। মানুষ দেখলেই এরা অতি শান্তভাব ধারণ করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, আহত শিকারী অচৈতন্য অবস্থায় জঙ্গলে পড়ে আছেন; পুমা সারারাত্রি আহত শিকারীকে পাহারা দিয়েছে।

হাতির সামনে যে দুটি ইয়া বড় গজদন্ত দেখা যায়, ইংরাজীতে তাকে বলে টাস্ক (Tusk)। আফ্রিকার পুরুষ হাতির গজদন্ত থাকে

প্রকাণ্ড বড়, মাদি হাতির কিঞ্চিৎ ছোট। ভারতীয় পুরুষ হাতির গজদন্ত থাকে, কিন্তু মাদি হাতির থাকে না। আবার কোনো কোনো পুরুষ হাতির গজদন্ত থাকে না, তাকে বলে মাখ্না।

বার্ধক্যে বা রোগে যখন বন্য হাতির স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয়, তখন তারা সাধারণত জলাশয়ের ধারে অর্ধ-নিমজ্জিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে অথবা পড়ে থাকতে দেখা যায়।

হাতির দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ কিন্তু ঘ্রাণশক্তি প্রখর। প্রায় এক মাইল দূর হতে মানুষ বা শত্রুর অবস্থান টের পায়।

বাঘ কখনও মানুষ খায় না। নানা কারণে বাঘ মানুষ ধরে খায়।

সাপ মাত্রেই ডিম পাড়ে। কিন্তু চন্দ্রবোড়া ও লাউডগা সাপ বাচ্চা দেয়।

অজ অর্থ ছাগল। যে সাপ ছাগল খেতে ভালবাসে সে-ই অজগর। অপর নাম ময়াল সাপ। অজগরের বিষ নাই।

গরুর বাঁট থেকে কোনো সাপই দুধ খেতে পারে না। কারণ, সাপের জীভ সরু লিকলিকে। টেনে খাবার ক্ষমতা নেই।

গোসাপ, তক্ষক, আঞ্জনি এরা সাপ নয়—গিরগিটি জাতীয় প্রাণী। এদের কারোর মুখেই বিষ নেই।

আফিমখোরকে বিষধর সাপে কামড়ালে আফিমখোরের মৃত্যু অনিবার্য। সেরূপ নেউলকেও সাপে ছোবল দিয়ে বিষ ঢালতে পারলে নেউলেরও মৃত্যু হওয়া স্বাভাবিক।

ডল্‌ফিন বা শুশুক মানুষের খুব প্রিয় বন্ধু। অনায়াসেই পোষ মানে এবং মানুষের আদেশ যথাযথভাবে পালন করে।

বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে বিচিত্র প্রাণীর সমাবেশ, ভাবলে আশ্চর্য লাগে। জন্তু-জানোয়ারের ইতিহাস ঘাঁটলে এ-সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য জানা যায়।





ভারতের বিভিন্ন সংরক্ষিত বন

বর্তমানে ভারতে ছোটবড় অনেকগুলো বনাঞ্চল রয়েছে। তার মধ্যে সুব্যবস্থা সমন্বিত ষোলটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের (অভয়ারণ্য) বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হল।

১। মানস (আসাম) :—

গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত সংরক্ষিত মানস বনাঞ্চল। মানস বনাঞ্চলের একদিকে মানস নদী ও আর একদিকে বেকী নদী প্রবাহিত।

প্রচুর বন্যজন্তু ও পাখি রয়েছে। নদীতে মাছ। বঁড়শি ডুবলেই মাছ ধরা পড়ে। বনে বুনো মোষ, হাতি, বাঘ, চিতল, গণ্ডার, সম্বর, সোনালী বাঁদর ইত্যাদি। অক্টোবরই উপযুক্ত সময়। মাথানগুড়িতে (Mathanguri) একটি রেস্ট-হাউস রয়েছে। নদীপথে রাবার বোটে আট-দশ মাইল ভেসে ভেসে প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বন্যজন্তু দর্শন সত্যিই রোমাঞ্চকর। আট-দশ মাইল যাওয়ার পর জীপে করে আপনি পুনরায় রেস্ট-হাউসে ফিরে আসতে পারেন।

২। কাজিরাঙ্গা (আসাম) :—

বর্তমানে গণ্ডারের আদি বাসস্থান। কাজিরাঙ্গা ফরেস্টে গণ্ডারের সংখ্যা ১৯৭৮ সনের সরকারী হিসাবে ৯৬০। ফেব্রুয়ারি মাসে এখানে ঝাঁকে ঝাঁকে গণ্ডার দেখা যায়। তখন মাটি শুকিয়ে যায় আর ঘাসবনগুলো আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া বুনো মোষ, হাতি, হরিণ, বাঘ রয়েছে। জোড়হাট থেকে ফরেস্টে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। টুরিস্ট লজ্ ও ফরেস্ট রেস্ট-হাউস রয়েছে।

৩। জলদাপাড়া (জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ) :—

গণ্ডারই বিশেষত্ব। কাজিরাঙ্গার তুলনায় এখানে গণ্ডারের সংখ্যা কম। চিতাবাঘ, বাঘ, বার্কিংডিয়ার, সম্বরও রয়েছে। কলকাতা থেকে

দার্জিলিং মেলে যাওয়াই সুবিধা।

৪। হাজারীবাগ ন্যাশনাল পার্ক (বিহার) :—

শালবন পরিবেষ্টিত এই বনে বাইসন, বাঘ, হরিণ, সম্বর রয়েছে যথেষ্ট। জীপে করে দেখবার ব্যবস্থা আছে। রেস্ট-হাউস রয়েছে। তাছাড়া রাঁচি থেকেও যাওয়া যায়।

৫। পেরিয়র (Periyer, কেরল) :—

কেরল ও তামিলনাড়ু সীমান্তে পেরিয়র হ্রদের তটভূমির গভীর অরণ্যে ভারত সরকার হাতি, বাইসন বা গাউর (Gaur), বুনো শুয়োর, বাঘ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী বিচরণের জন্য সুন্দর সংরক্ষিত বনাঞ্চল তৈরি করেছেন। দর্শনের উপযুক্ত সময় নভেম্বর হতে জুলাই মাস। বিশেষ আকর্ষণ, মোটর লঞ্চে চড়ে জীবজন্তু দর্শন করা যায়। থেকাড্ডীতে অরণ্য-নিবাস নামে একটি হোটেল আছে, সিঙ্গলরুমের চার্জ খাওয়া-থাকা ইত্যাদি সমেত ৩০ টাকা এবং ডবলরুমের চার্জ ৫৫ টাকা ছিল। এখন কত আমার জানা নেই।

৬। মধুমালাই (তামিলনাড়ু) :—

নীলগিরি পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। অপর পাশে মহীশূরে (কর্ণাটক) বান্দিপুর বনাঞ্চল। উভয় বনভূমি একেবারে পাশাপাশি অবস্থিত। হাতি, গাউর, মাউসডিয়ার প্রভৃতি রয়েছে। ফরেস্ট রেস্ট-হাউস ও Abhayaranyam নামে একটি টুরিস্ট লজ্ আছে।

৭। বান্দিপুর (কর্ণাটক) :—

চন্দন গাছ, টিক ও অন্যান্য জাতীয় গাছে আবৃত। গউর বা বাইসন এর বিশেষত্ব। স্পটেড্ ডিয়ার, হাতি, বাঘ ও পাখিও রয়েছে। থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। একটি পি. ডবলিউ. ডি-র গেস্ট-হাউস রয়েছে। সমস্ত বনে মোটর চলাচলের রাস্তাও আছে।

৮। বেদান্থঙ্গল বার্ড স্যাংচুয়ারি (Vedanthangal Bird Sanctuary, তামিলনাড়ু) :—

১৫০০ বছরের পুরনো বনাঞ্চল।

৯। রঙ্গনথিট্টো বার্ড স্যাংচুয়ারি (Ranganthitoo Bird Sanctuary, কর্ণাটক) :—

ইহা কাবেরী নদীর একটি দ্বীপ জাতীয় চর-ভূমির সহিত সংযুক্ত। মহীশূর শহর থেকে সহজেই যাওয়া যায়। নানা জাতীয় পাখিই ইহার বিশেষত্ব।

১০। শিবপুরী ন্যাশনাল পার্ক (মধ্যপ্রদেশ) :—

অতি সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে উঠেছে। এখানে প্রচুর চিঙ্কারা, সম্বর, বাঘ ও চিতাবাঘ আছে। হ্রদ অঞ্চলে প্রচুর পাখিও দেখা যায়। শিবপুরীতে একটি সার্কিট হাউস ও ডাক-বাংলো আছে। হ্রদে নৌকোয় ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে।

১১। কান্‌হা ন্যাশনাল পার্ক (মধ্যপ্রদেশ) :—

সুবিস্তীর্ণ ঘাসযুক্ত ময়দানে একসঙ্গে নানা বন্যজন্তু দেখা যায়। ভারতীয় Swamp deer যাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় শিঙ্গা—প্রচুর দেখা যায়।

১২। চন্দ্রপ্রভা বনাঞ্চল (উত্তরপ্রদেশ) : —

নীলগাই, চিতল ও চিতাবাঘ আছে। ১৯৫৪ সনে ভারত সরকার গিরবন হতে তিনটি সিংহ এনে ছেড়েছেন। সিংহ তিনটি এখনো সুস্থ শরীরে জীবিত আছে। মনে হয় উত্তরপ্রদেশের আবহাওয়ায় ওরা নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছে।

১৩। করবেট ন্যাশন্যাল পার্ক (উত্তরপ্রদেশ) :—

প্রসিদ্ধ বন্যপ্রাণী প্রেমিক ও শিকারী জিম করবেটের নাম অনুসারে এই বনাঞ্চলটির নাম রাখা হয়েছে। এখানে প্রচুর শাল গাছ আছে। বাঘ, চিতাবাঘ, বার্কিং ডিয়ার, ভল্লুক ও কুমির এখানে দেখা যায়। থাকার জন্য ফরেস্ট রেস্ট-হাউস আছে।

১৪। ডাচিগাঁও স্যাংচুয়ারি (কাশ্মীর) :—

শীতকালে নিম্ন ডাচিগাঁও অঞ্চলে মাউন্টেন গোট্ (পাহাড়ী ছাগল) ও হিমালয়ান ভল্লুক দেখা যায়। উঁচু ডাচিগাঁও অঞ্চলে বাদামী ভল্লুক,

মাস্ক ডিয়ার প্রচুর দৃষ্টিগোচর হয়। যথেষ্ট পাখিও দেখা যায়। হাউস বোট ছাড়া শ্রীনগরে প্রচুর হোটেলও রয়েছে।

১৫। কেওলাদেওখানা বার্ড স্যাংচুয়ারি (রাজস্থান) :—

আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাস দর্শনের উপযুক্ত সময়। 'শান্তি কুটির রেস্ট-হাউস'-এ থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। বনবিভাগ হতে নৌকোরও ব্যবস্থা করা হয়। পাখিই এখানের বিশেষত্ব।

১৬। গিরবন (গুজরাট) :—

এখানে সিংহই বিশেষত্ব। পৃথিবীতে গিরবন ও আফ্রিকা ছাড়া কোথাও সিংহ পাওয়া যায় না। থাকা-খাওয়া ও দেখার সুব্যবস্থা আছে। এই অঞ্চলে কচ্ছের রানে প্রচুর বুনো গাধা দেখা যায়।

